দুঃস্বপ্নের রাত এবং দুর্ভাবনার দিন

ইকবাল

দুঃস্বপ্নের রাত এবং দুর্ভাবনার দিন

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

কাকলী প্রকাশনী

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৩

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষর বিন্যাস
কম্পিউটার গ্যালাক্সী
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৫/৬ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

দাম ৭৫ টাকা

ISBN 984-437-299-2

উৎসর্গ

সাহসী সাংবাদিক আবেদ খান

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

সারা বছর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো এই বইটিতে সংকলিত করতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করেছি যে বাংলাদেশের জন্য ২০০২ বছরটি একটি শুভ বছর ছিল না। ফরমায়েসী একটি-দুটি লেখা ছাড়া সারা বছর আমি যা লিখেছি তার পুরোটুকুই ছিল ক্ষোভের লেখা। পড়াশোনা নিয়ে ক্ষোভ, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ক্ষোভ, ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে ক্ষোভ, গ্যাসসম্পদ অপচয় নিয়ে ক্ষোভ, লেখক-সাংবাদিক পীড়ণ নিয়ে ক্ষোভ, সামরিক বাহিনীর অত্যাচার নিয়ে ক্ষোভ, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন নিয়ে ক্ষোভ, মানুষের অধিকার নিয়ে ক্ষোভ, মৌলবাদীর উত্থান নিয়ে ক্ষোভ, সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের সম্মান নিয়ে ক্ষোভ। সে-কারণে এই বইটির নাম হিসেবে যে শিরোনামটি বেছে নিয়েছি সেই নামটিতে দুঃস্বপ্ন এবং দুর্ভাবনা কথা দুটি এত উচ্চস্বরে উচ্চারিত।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
৩/১/০৩

সূ / চি / প / ত্র

ছোট ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে নয়, প্লিজ...

১.

ছিয়াত্তর সালে আমি যখন দেশ ছেড়ে গিয়েছিলাম আমি তখনও জানতাম না দেশে ফিরে আসতে আসতে আমার আঠারো বছর পার হয়ে যাবে। দেশে থাকতে যে মানিব্যাগটা ব্যবহার করতাম আমি সেটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সেটা আমি আঠারো বছর সযত্নে রক্ষা করেছিলাম। তার ভেতরে কিছু বাংলাদেশের টাকা ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের হিসাবে তার কোনো মূল্যই ছিল না কিন্তু দেশের স্মৃতি হিসেবে আমার কাছে তার অন্যরকম একটা মূল্য ছিল। আঠারো বছর পর চুরানব্বইয়ের ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরে এসে একদিন আমি সেই মানিব্যাগটি পকেটে নিয়ে বের হয়েছি। মনে আছে, রিকশা করে এক জায়গায় গিয়ে রিকশা ভাড়া দেওয়ার জন্য সেখান থেকে একটা নোট বের করে রিকশাওয়ালার হাতে দিয়েছি। রিকশাওয়ালা খানিকক্ষণ নোটটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার এই নোট আপনি কোথায় পেয়েছেন?'

আমি বললাম, 'কেন, কী হয়েছে?'

রিকশাওয়ালা লাল রংয়ের সেই নোটটি খুলে তার ভেতরে বঙ্গবন্ধুর ছবিটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই নোট তো এখন চলে না, স্যার।'

আমি নোটটি ফিরিয়ে নিলাম, সদ্য বাইরে থেকে এসেছি, এখনো সবকিছু ভালো করে জানি না। আমি তখনো জানতাম না পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর গত দুই দশকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে একবারও তার নাম উচ্চারিত হয়নি। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এই দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। তার ছবি আঁকা নোট, ডাকটিকেট, স্মারকগ্রন্থ, বইপত্র, রাস্তাঘাট, ভবন কিছুই আর এ-দেশে নেই।

ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচনে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুকে আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। তিনি মানুষের হৃদয়ে বেঁচে ছিলেন তাই সহজ স্বাভাবিক অংশটুকুতে খুব সহজে ফিরে এসেছেন। একুশ বছরের অবরুদ্ধ আবেগের কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে খানিকটা যে

বাড়াবাড়ি হয়নি তা নয়। আমরা যারা বিশ্বাস করি বাড়াবাড়ি করা হলে বঙ্গবন্ধুকে অসম্মান করা হয়, পত্রপত্রিকায় সেটা নিয়ে লেখালেখি করেছি এবং আওয়ামী লীগ সরকারের বিরাগভাজন হয়েছি।

গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনে চারদলীয় জোটের বিজয় হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুকে সরিয়ে দেওয়ার কাজটি আবার শুরু হয়েছে। এবারের ছবিটি একটু অন্যরকম—বঙ্গবন্ধুকে সরিয়ে দেওয়ার কাজটি শুরু হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে। বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর যে কমবয়সী কর্মীরা বঙ্গবন্ধুর ছবি অফিস থেকে নামিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বা পা দিয়ে দলিত করেছে তারা কখনো বঙ্গবন্ধুকে দেখেনি, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য এই দেশের সকল মানুষকে তিনি কীভাবে একতাবদ্ধ করেছিলেন সেই বিশাল প্রক্রিয়াটিও নিজের চোখে দেখার তাদের সৌভাগ্য হয়নি। স্বাধীনতার পর দেশ চালাতে গিয়ে তার যে সকল সীমাবদ্ধতা এবং ভুলক্রটি হয়েছিল সেটিও তারা দেখেনি, তবুও একটি আশ্চর্য প্রতিহিংসা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির ওপর তারা আঘাত করেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেটি ঘটতে দিয়েছে, সেই সময়কার রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সেটি নিয়ে কোনো কথা বলেননি।

নতুন সরকার তাদের কাজকর্ম শুরু করেছে, মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে আসছে যে, তাদের কাজকর্মের একটা বড় অংশ হবে অতীতকে নিয়ে। চাটুকাররা এর মাঝে মাঠে নেমে গিয়েছেন, বক্তৃতা এবং বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে। বইপত্র লেখা হয়েছে, টেলিভিশনে নাটক লেখা হয়েছে এবং পরের পাঁচ বছরে খুব ভালোভাবে দেশ চালিয়ে সবাইকে তাক না লাগিয়ে দিয়ে অতীতের সবকিছুই যে আসলে তাদের একক অর্জন সেটাতেই গুরুত্বটা অনেক বেশি দেওয়া হচ্ছে। আমরা যারা এই দেশের রাজনৈতিক নেতাদের দেখে অভ্যস্ত তারা সেগুলোকে কখনো কৌতুক, কখনো উপদ্রব, কখনো নির্বুদ্ধিতা হিসেবে সহ্য করে নিই।

কিন্তু এবারে এমন একটা ব্যাপার ঘটেছে যেটা সহ্য করে নেওয়া যাচ্ছে না—পাঠ্যবইয়ে এমন কিছু তথ্য ঢোকানো হয়েছে যেটি সত্যি নয়। তথ্যগুলো আমার নিজের চোখে দেখা এবং নিজের কানে শোনা, আমি যদি এর প্রতিবাদ না করি তা হলে নিজের কাছে নিজে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকব।

২.

স্কুলের বারো-তেরো বছরের ছেলেমেয়েদেরকে অনেকে ছোট হিসেবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে থাকে—আমি করি না। আমার বয়স যখন বারো-তেরো

বছর ছিল আমি সেই সময়কার কথা চিন্তা করলেই বুঝতে পারি যে, এটি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার বয়স না, এটি জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়, তার নিজের চিন্তা-ভাবনার জগৎ এর মাঝে তৈরি হয়ে যায়। কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা, কোনটি ন্যায়, কোনটি অন্যায় তারা খুব ভালোভাবে জানে। আমাদের দেশের এই জটিল পরিস্থিতিতে কীভাবে বেঁচে থাকতে হয় সেটা সম্পর্কেও তাদের খুব পরিষ্কার ধারণা আছে। আমার মনে আছে বছর দুয়েক আগে একজন ছাত্র বা ছাত্রী আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে, এসএসসি পরীক্ষায় যদি বঙ্গবন্ধু যমুনা ব্রিজের ওপর রচনা আসে সে সেটি না লিখে অন্য কিছু লেখার চেষ্টা করবে, কারণ যে শিক্ষক খাতা দেখবেন তিনি যদি বিএনপিপন্থী হন তা হলে অবধারিতভাবে বঙ্গবন্ধু নামটির জন্য কম মার্ক দেবেন। পাঠ্যবইয়ে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভূমিকা নিয়ে যে তথ্যগুলো দেওয়া হয়েছে সেই তথ্যগুলোও ছেলেমেয়েরা একই ধরনের আতঙ্ক নিয়ে দেখবে, ভুলেও পরীক্ষার খাতায় লিখে নিজেকে বিপদগ্রস্ত করবে না।

পুরো ব্যাপারটি চিন্তা করে আমি এক ধরনের গভীর অপরাধবোধে জর্জরিত হই, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায় যে, আমরা আমাদের দেশে ছোট ছেলেমেয়েদেরকে রাজনীতির একটা নোংরা খেলা থেকে রক্ষা করতে পারিনি। পাঠ্যবইয়ে লেখা কিছু তথ্যের দিকে তাকিয়ে তারা অবাক হয়ে ভাববে এই দেশের বড় মানুষেরা কী বিচিত্র, চাটুকারিতা করার জন্য কী সহজে তাদেরকে কী বিপদের মাঝে ফেলে দিল! তারা এখন কোথায় যাবে?

৩.

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পঁচিশে মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেই ভয়াবহ পৈচাশিক আক্রমণের পর ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন—আজকের প্রজন্ম জানে না ১৯৭১ সালের সেই উত্তাল দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে ঘোষণা না দিলে সেটি হতো পুরোপুরি গুরুত্বহীন, অর্থহীন একটা ব্যাপার। সেই সময়ে বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সমার্থক শব্দ ছিল। আমি এবং আমার মতো আরো অনেকে নিজের কানে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সেই ঘোষণাটি শুনেছিলাম, কোথায় দাঁড়িয়ে কীভাবে সেটি শুনেছিলাম, সঙ্গে কে ছিল এবং সেই ঘোষণাটি শুনে আমরা কী আশ্চর্য এক ধরনের সাহস এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম সব আমাদের স্পষ্ট মনে রয়েছে। আমাদের এই প্রজন্ম বেঁচে থাকতে থাকতে এত বড় একটি

ব্যাপার নিয়ে এ রকম নির্জলা একটি মিথ্যা কথা বলা খুব অনুচিত কাজ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একটা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। সেই ভূমিকার মাঝে মিথ্যা কথা ঢুকিয়ে দিয়ে তার পুরো ভূমিকাটার মাঝেই যে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে চাটুকাররা কি সেটি একবার চিন্তা করে দেখেছেন?

এটি ১৯৩৯ সাল নয়, এটা নাৎসি জার্মানি নয় এবং চাটুকাররা কেউ গোয়েবলস নন যে একটা মিথ্যা কথাকে বারবার বলে সেটাকে সত্যি কথা বলে প্রমাণ করে দেবেন। এটি একটি নতুন পৃথিবী, এটাকে বলে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ, এখানে তথ্য এমন পাকাভাবে সংরক্ষণ করা যায়, মুহূর্তের মাঝে সারা পৃথিবীতে এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় যে কেউ সেটাকে বিকৃত করতে পারে না। কেউ যদি চেষ্টা করে সে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটা উদাহরণ দিই, নির্বাচনের পরপর আমাদের দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যখন অমানুষিক নির্যাতনের ব্যাপারটি ঘটতে শুরু করেছে তখন যুক্তরাষ্ট্রের একটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই দেশে যেরকম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন যিনি এই নির্যাতনের কথা বিশ্বাস করেন না, মনে করেন এটি আওয়ামী লীগের অপপ্রচার ঠিক সেরকম যুক্তরাষ্ট্রেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টাইপের অনেক মানুষ আছেন। তারাও হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের কথা বিশ্বাস করেন না এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেই সংগঠনটির পিছনে তারা লেগে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করে দিলেন, তাদেরকে 'আওয়ামী লীগার' বলে গালাগালি করতে লাগলেন। অনেকে এই সংগঠন থেকে সরে যাবার হুমকি দিলেন। সংগঠনের কর্মকর্তারা খুব বিপদে পড়ে আমার কাছে পুরো ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে জানিয়ে একটি দীর্ঘ ই-মেইল পাঠিয়ে তারা কী করবেন জানতে চাইলেন। আমি কি কোনোভাবে তাদের সাহায্য করতে পারি কিনা সেটি তাদেরকে জানাতে অনুরোধ করলেন।

আমি কী লিখব বা কী করব বুঝতে পারলাম না। এর মাঝে সপ্তাহ দুয়েক কেটে গেছে। শেষে একদিন বসে তাদের ই-মেইলের উত্তর দিলাম, লিখলাম আপনারা যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্যায় আছেন এখানেও আমাদের সেই একই সমস্যা। এটি একটি মানবিক ব্যাপার, মানুষের বিষোদ্গার সহ্য করে একটি মানবিক কাজে লেগে থাকবেন কিনা সেই সিদ্ধান্তটি আপনাদেরই নিতে হবে। আমি ই-মেইল পাঠানোর কিছুক্ষণের মাঝেই তার উত্তর চলে এলো, কর্মকর্তারা খুব উৎফুল্ল হয়ে আমাকে দুশ্চিন্তা বা মন খারাপ করতে নিষেধ করেছেন। তারা লিখেছেন, তাদের প্রথম ই-মেইলের পর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে তার খবরাখবর, ছবি, ভিডিও যুক্তরাষ্ট্রে এমনভাবে প্রচারিত হয়েছে যে, ব্যাপারটি যে সত্যি তাতে এখন কারো মনে কোনো দ্বিধা নেই। সবাই তাদের সাহায্য করছেন, সবচেয়ে বড় সাহায্যটি আসছে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ থেকে। এমনকি সেখানকার একটি রেডিও স্টেশনের একজন ডিস্ক জকি তার রেডিও স্টেশন থেকে সার্বক্ষণিকভাবে এটি প্রচার করে অর্থ সাহায্য তুলে যাচ্ছেন। আমাদের দেশে রেডিও মাধ্যমটির ততো প্রচার নেই, যুক্তরাষ্ট্রে ঠিক তার উল্টো, দীর্ঘ সময় গাড়িতে থাকতে হয় বলে সবাই গাড়িতে রেডিও শুনতে অভ্যস্ত, একজন ডিস্ক জকি সেখানে মানুষের মাঝে খুব প্রভাব ফেলতে পারে।

এই খবরটি শুনে আমি একই সঙ্গে আনন্দিত এবং ব্যথিত হয়েছিলাম। আমাদের দেশের দুঃখী এবং নির্যাতিত মানুষের জন্য সারা পৃথিবী থেকে সাহায্য এবং সমবেদনার হাত এগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আনন্দ কিন্তু এই দেশে মানবতার এই চরম অবমাননার কথাটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গিয়ে দেশের সম্মানটি ভূলুণ্ঠিত হয়েছে বলে এক ধরণের লজ্জা। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারটি নিয়ে আমি যতবার খবরের কাগজে লেখালেখি করেছি, ততবার সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম এটি তথ্যপ্রযুক্তির যুগ, একেবারে ঘরের কথাটি চোখের পলকে সারা পৃথিবী জেনে যাবে। আমি জানি এই দেশের মানুষ সাম্প্রদায়িক নয়। কিছু দুর্বৃত্ত দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি অত্যন্ত কঠোর হাতে তাদের দমন করা হতো, ব্যাপারটির সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পত্তি হতো। তা করা হয়নি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুর্বৃত্তদের শাস্তি না দিয়ে তাদের উৎসাহ দিলেন। আমি নিশ্চিত মানবতার বিরুদ্ধে চরম অবমাননায় সহায়তা করে তিনি ইতোমধ্যে ইতিহাসে নিজের জন্য একটি কালো অধ্যায় সৃষ্টি করে ফেলেছেন। তার নিজের সেটি নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই, কিন্তু সারা পৃথিবীর সামনে আমাদের দেশ ছোট হয়ে যায় বলে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়।

ঠিক একই ব্যাপার আবার ঘটতে যাচ্ছে। কিছু মানুষ আছে যাদের মিথ্যা কথা বলতে বলতে এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, যখন সত্যি কথা বললে লাভ হয় তখনো তারা মিথ্যা কথা বলে বসে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একটা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল সেই সত্যি কথাটি না বলে তাকে নিয়ে মিথ্যা কথা বলে কিছু মেরুদণ্ডহীন চাটুকার সবার সামনে তার অসম্মান করতে শুরু করেছেন। এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে এটা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং অল্পকিছু দায়িত্বহীন চাটুকারের জন্য সারা পৃথিবীর

সামনে আবার আমরা লজ্জা পেতে যাচ্ছি। একটা মিথ্যা কথাকে সত্যি প্রমাণ করা ভয়ঙ্কর কঠিন—যে কোনো ঘটনার সঙ্গে অন্য দশটি ঘটনার যোগসূত্র থাকে, শুধু একটি ঘটনাকে পাল্টে দিলে হয় না, তার সঙ্গে অন্যগুলো পাল্টাতে হয়। ছোট একটা মিথ্যা কথার জন্য চক্রবৃদ্ধি হারে একটা মিথ্যার পাহাড় এসে জমা হয়। যারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠ্যবইয়ে মিথ্যা কথা লিখেছেন তাদেরকে শুধু দেশের নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের সামনে জবাবদিহি করতে হবে। তারা কি প্রস্তুত আছেন?

৪.

বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃতির একটা গুরুতর অভিযোগ এসেছে। (আমি অবশ্যি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ইতিহাস ইতিহাসই—তাকে বিকৃতি করা যায় না, সেটা কীভাবে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে তার মাঝে বিকৃতি আনার চেষ্টা করা যায়)। যেভাবেই বলা হোক, আসলে যা ঘটেছিল সেটাকে অন্যভাবে লেখার চেষ্টা যে চলছে সে-ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। সব পত্রিকাতেই সে-সব নিয়ে সংবাদ বের হয়েছে। ব্যাপারটা বক্তৃতা-বিবৃতির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলে এটি আমাদের এত বিচলিত করতো না—কারণ এসব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের পাঠ্যবইয়ে চলে এসে সবাইকে বড় ধরনের ধাক্কা দিয়েছে। ইতিহাসকে অসত্যভাবে লেখার জন্য ইতিহাসের যে অংশটুকু বেছে নেওয়া হয়েছে সেটা তুলনামূলকভাবে এত সাম্প্রতিক যে, যাদের বয়স চল্লিশের বেশি তাদের অনেকেই এই ঘটনাটি নিজের চোখে দেখেছে, না হয় নিজের কানে শুনেছে। যদি আরো পঞ্চাশ বছর পরে এটা করা হতো যখন এই প্রজন্মের কেউ বেঁচে নেই তা হলে ব্যাপারটি হয়তো সহজ হতো, এখন আর সহজ নয়। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটাকে অন্যভাবে লিখে ফেলা নিঃসন্দেহে একটি বড় অপরাধ—আমার ধারণা এই সরকার বা তার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছুদিনের মাঝেই আবিষ্কার করবে এটি যেটুকু অপরাধ তার থেকে অনেক বড় নির্বুদ্ধিতা। এ ধরনের কিছু করার আগে এমন একটি বিষয় বেছে নিতে হয় যার ভেতর অল্পবিস্তর বিতর্ক বা খানিকটা বিভ্রান্তির জায়গা থাকে, সেই বিতর্ক বা বিভ্রান্তির আড়ালে একটা সত্যকে সরিয়ে একটা মিথ্যা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এই ব্যাপারটিতে কোনো বিতর্ক নেই, কোনো বিভ্রান্তি নেই, যে কথা মানুষ নিজের কানে শুনেছে সেটি নিয়ে কেমন করে বিতর্ক থাকবে? কেমন করে বিভ্রান্তি থাকেব?

আমরা পড়াতে গিয়ে যদি আবিষ্কার করি সেখানে লেখা আছে কার্বনের আণবিক নম্বর ৪২, আমরা কিন্তু সেভাবে পড়িয়ে ফেলি না। ভুলটা শুদ্ধ করে পড়াই। কারণ আমরা জানি কোনো একটা কিছু ছাপা হলেই সেটা শুদ্ধ হয়ে যায় না—সেটা সত্যি হয়ে যায় না। এমনকি কোনো কিছু পার্লামেন্টে পাস করিয়ে নিলেও সেটা সত্যি হয়ে যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যে একবার গণিতের পাইয়ের মান ৪ হিসেবে পাস করে নেওয়া হয়েছিল, তাতে কিন্তু পাইয়ের প্রকৃত মান (৩.১৪১৫৯২৬...)-এর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। এখানেও তাই ছোট ছোট বাচ্চাদের স্কুলের বইয়ে একটা অসত্য জিনিস লিখে দিলেই সেটি সত্যি হয়ে যাবে না, আমরা যারা সত্যটুকু জানি আমাদের ওপর দায়িত্ব এসে পড়ে সেই অসত্যটুকু শুধরে দেওয়ার।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে করজোড়ে আবেদন করি, আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রাষ্ট্রীয়ভাবে মিথ্যা কথা বলতে শেখাবেন না।

দোহাই আপনাদের!

দৈনিক প্রথম আলো, ২০/২/০২

আমরা আজ বড় বুভুক্ষু

১.

প্রথম আলোতে প্রায় মাস দেড়েক আগে খবরটি এসেছিল 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' শিরোনামে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের হাত-পা কেটে নেওয়া হচ্ছে, চোখ তুলে নেওয়া হচ্ছে, বাড়িঘর পুড়িয়ে ঘরছাড়া করে দেওয়া হচ্ছে—এ ধরনের খবর আর পড়তে ইচ্ছে করে না, তারপরও কৌতূহলের বশে খবরটিতে চোখ বুলিয়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। বাবা এবং ভাই আওয়ামী লীগ করে বলে পুরোপুরি নিরপরাধ একটা কিশোরীকে গণধর্ষণ করে তার ছবি তুলে রাখা হয়েছে। সরকারি দলের সদস্য হিসেবে কেউ তাদের স্পর্শ করবে না সেই আত্মবিশ্বাসে ছবিগুলো স্থানীয় এলাকায় প্রদর্শন করা হয়েছে। দিনমজুর বাবা সেই ছবিগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করল, ধর্ষিতা মেয়েটি বুক বেঁধে চার দিন অপেক্ষা করল যে হয়তো তার বাবা সেই গ্লানির চিহ্নগুলো উদ্ধার করতে পারবে, বাবা পারল না। মেয়েটি তখন একটি বিষের পাত্র মুখে তুলে তার সমস্ত দুঃখ, কষ্ট এবং লজ্জার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দিল। বিষের পাত্রটিতে চুমুক দেওয়ার আগের মুহূর্তে তার বুকের ভেতর কী ধরনের অনুভূতি কাজ করেছিল? সে কি চারদিকে তাকিয়ে ভেবেছিল এই বিশাল পৃথিবীতে একটি মানুষও কি নেই যে তাকে এই ভয়ঙ্কর অবিচার থেকে রক্ষা করতে পারে, মানুষের সম্মান দিতে পারে? একটা ধর্ষিতা বালিকার সেই দুঃসহ অভিমান কি পুরো দেশের সকল অর্জনকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারে না?

আমি খবরটি একবারে পড়তে পারিনি, সাহস সঞ্চয় করে একটু একটু করে পড়েছি। খবরটি পড়ে আমি কাগজটি লুকিয়ে রেখেছিলাম যেন বাসার আর কারো চোখে না পড়ে। আমি ঠিক জানি না কেন আমার নিজের ভেতরে এক ধরনের গ্লানি এবং অপরাধবোধ কাজ করছিল, মনে হচ্ছিল কাগজটি লুকিয়ে রাখলেই বুঝি এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটি শেষ হয়ে যাবে। মনে হচ্ছিল বিএনপির কিছু দুর্বৃত্ত নয়, মানুষ হিসেবে আমরা সবাই এর জন্য দায়ী, আমরাই কোনো-না-কোনো ভাবে এই দেশের মাটিতে এটা ঘটতে দিয়েছি।

ঈদের ছুটিতে নারী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনারা মহিমাকে বাঁচাতে

পারলেন না?’ আমি তাকে জিজ্ঞেস করিনি, ‘কেন এটা হলো?’ কিংবা ‘অপরাধীদের কি শাস্তি দেওয়া যাবে?’ আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম এত বড় একটা নির্যাতনের পর শুধু বেঁচে থাকার একটি সুযোগও এই দেশ তাকে দিতে পারে না? আমার প্রশ্ন শুনে নারী সংগঠনের সেই নেত্রী ম্লান মুখে বলেছিলেন, ‘না, পারিনি।’ তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘তবে গত সপ্তাহে অন্য একজনকে বাঁচিয়েছি।’ সেই অন্য একজন কে, তাকে কীভাবে, কোথা থেকে বাঁচিয়েছেন আমি জিজ্ঞেস করিনি। হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছিলাম খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় চলে এসেছে বলে মহিমার কষ্টটুকু পড়ে আমাদের বুক ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু এরকম আরো কত মহিমা এ দেশের আনাচে-কানাচে না-জানি মানুষের আরো কত নিষ্ঠুরতা সহ্য করে মুখ বুঁজে দিন কাটাচ্ছে। জাহাঙ্গীরনগরের ছাত্রীরা এগিয়ে না এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সেঞ্চুরিয়ান ধর্ষকের কথাই কি জানতে পারতাম? দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠেই যদি সবচেয়ে জঘন্য অপরাধকে লালন করা হয়, তা হলে আমরা কোথায় আশা খুঁজে পাব?

মহিমা চার দিন পর বিষ খেয়ে নিজের সব দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটিয়েছে, সাবিনা নামে আরো একটি মেয়েকে দ্বিতীয়বার গণধর্ষণ করে খুন করেছে সেই একই বিএনপির দুর্বৃত্তরা। মেয়েটি বিচারের জন্য পুলিশের কাছে গিয়েছিল, পুলিশ ভ্রূক্ষেপ করেনি—এই দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদেশ দিলে পুলিশ চার্জশিট দেয়, তা না হলে তারা ভ্রূক্ষেপ করে না।

এ রকম কতকগুলো উদাহরণ দিতে হবে?

২.

মহিমার ঘটনার পর বিএনপি নেতৃবৃন্দ বলেছেন এটি ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’, কেউ যেন এর থেকে ‘রাজনৈতিক ফায়দা’ লোটার চেষ্টা না করে। সোজা বাংলায় বিএনপির সদস্যরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে সেটা বলা যাবে না, বলতে হবে কিছু অপরাধী নিজেদের দায়িত্বে এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে; এর দায়-দায়িত্ব সমাজের, দেশের, পৃথিবীর। বিএনপির নয়। যার অর্থ প্রথম আলোর ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ হেডলাইনটি সত্য নয়, এটি ‘বিচ্ছিন্ন অপরাধীদের’ বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ পত্রিকায় লিখেছেন আলাদাভাবে এই ঘটনার কথা বলে অভিযোগ করা যাবে না, আগে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। অন্যায় এখন তুলনামূলক একটি ব্যাপার—আগের সরকার করে থাকলে এই সরকারও করতে পারবে। অন্যায়

ঘটেছে কিনা সেটি প্রশ্ন নয়, আগের সরকার ে কে বেশি ঘটেছে কি না সেটি হচ্ছে প্রশ্ন।

আসলেই কি এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা? গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র আমাদের সবাইকে তালাবদ্ধ করে আটকে রেখেছিল, পুলিশ এসে তালা ভেঙে আমাদের উদ্ধার করেছে। এই ছাত্রদের মাঝে আমার নিজের একজন ছাত্র আছে, যাকে আমি এতদিন নিরীহ কৌতুকপ্রিয় একজন ভালো মানুষ বলে জানতাম। নির্বাচনের পর হঠাৎ করে তার মাঝে একটা পরিবর্তন এসেছে, সে এখন তার নিজের শিক্ষককে তালা মেরে আটকে রাখার দুঃসাহস পায়। (আমি ছেলেটির বাসায় চিঠি লিখে তার অভিভাবককে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেছি, ঠিক কোন ব্যাপারটি একজন মানুষকে রাতারাতি পাল্টে দেয় আমি ব্যাপারটি বুঝতে চাই।) আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের একজন বিএনপি করেন (আওয়ামী লীগ আমলে ছাত্রলীগের ছেলেরা তাকে একবার চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়েছিল)। নির্বাচনের পর শুধু তার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে বলে একজন কলেজ শিক্ষক টিএনওকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি আর কলেজে ক্লাস নেবেন না। এমনিতেই বেতন নেবেন। আগে অনেক পরিশ্রম করেছেন এখন তার আত্মীয় সরকারি দল করেন, তিনি কেমন করে তুচ্ছ ক্লাস নেওয়ার মতো ব্যাপারে মাথা ঘামাতে পারেন? তাদের বাড়িতে ফুট-ফরমাস খাটত একটি ছোট ছেলেও কাজকর্ম করা ছেড়ে দিয়ে বাজারে ঘোরাঘুরি করে মাস্তানি করতে শুরু করেছে, সেও জেনে গেছে তাকে এখন কেউ ঘাঁটাবে না। এগুলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পরিসংখ্যানের হিসাবে তেমন গুরুত্ব না থাকতে পারে কিন্তু সমাজটি কোন পথে চলছে সেটি বেশ বোঝা যায়। খবরের কাগজ দেখলে মনে হয়, আওয়ামী লীগ পাঁচ বছরে সন্ত্রাস, অন্যায় আর অবিচারের যে তালিকা তৈরি করেছে বর্তমান সরকার যেন পণ করেছে তার চেয়ে অনেক কম সময়ে সেই তালিকা অতিক্রম করে ফেলবে। মনে রাখতে হবে সংবাদ হিসেবে গুরুত্ব পেতে পারে শুধু সেগুলো খবরের কাগজে আসে, সেগুলো অন্যায় আর অবিচারের এটা মাত্রা অতিক্রম করে থাকে—সেই মাত্রার নিচে অনেক ঘটনা আছে যেগুলো মানুষের দীর্ঘশ্বাসকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে চলেছে।

যারা বিএনপির সমর্থক তাদের সঙ্গে কথা বললেই তারা আজকাল কেমন জানি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন, নিজেদের সমস্যার কথা না বলে আওয়ামী লীগের ইতিহাস টেনে আনেন। সংবাদপত্র আওয়ামী লীগকে করুণা করেছিল বলে মনে হয় না। জয়নাল হাজারীর হাতে আহত সাংবাদিক টিপু সুলতানের

জন্য অর্থ সংগ্রহ করে তাকে সুস্থ করিয়ে আনার ব্যাপারটি দিয়ে বাংলাদেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র দীর্ঘদিন এই দেশের মানুষকে সেই ভয়াবহ ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বিএনপির বেলাতেও যে এ রকম কিছু ঘটবে না তারা সে ব্যাপারে এত নিশ্চিত হচ্ছেন কেমন করে?

পৃথিবীর সব দেশেই অল্প-বিস্তর অপরাধ করা হয়ে থাকে। যেসব দেশে আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারটি খুব গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া হয় সেখানেও অনেক বড় বড় অপরাধ ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন মানুষের কথা শুনেছি, সে অন্য মানুষকে ধরে এনে কেটেকুটে খেয়ে ফেলত, শরীরের কাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফ্রিজে রেখে দিত। জাপানের একজন মানুষ বেছে বেছে শিশুদের হত্যা করে এক ধরনের আনন্দ পেত। দেশের আইন যত কঠোরই হোক এই ধরনের অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না— সেই অপরাধীরা কিন্তু জানত তারা অপরাধী, তারা অপরাধগুলো করত ভয়ে ভয়ে, অপরাধীর মতো। কিন্তু আমাদের দেশে কী একটা ভয়াবহ জিনিস ঘটে গেছে, এখন অপরাধীরা অপরাধ করে সদর্পে, দশজনকে দেখিয়ে। সমাজবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলতে পারবেন কখন সমাজকে নিয়ে ভয় পেতে হয়। আমি সমাজবিজ্ঞানী নই কিন্তু শুধু কমনসেন্স দিয়ে বলতে পারি অপরাধীরা যখন ভয় পায় না তখন ধরে নেওয়া যায় সমাজের কাঠামোটি ভেঙে পড়েছে। আমাদের দেশে এখন তাই হচ্ছে, যারা অন্যায় করছে তারা এখন বেপরোয়া, দুর্বিনীত। তারা দর্পিত, তারা আত্মবিশ্বাসী, তারা এখন আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কোনো রকম অনুশোচনা বা অপরাধবোধ ছাড়া একটি অন্যায় করে ফেলে—আমরা অবাক হয়ে দেখি।

তাদের একমাত্র জোর রাজনৈতিক জোর।

৩.

অপরাধীরা আজকাল আর ভয় পায় না কেন তার কারণটি বোঝার জন্য আইনস্টাইন হতে হয় না, কারণটা আমরা সবাই জানি। অপরাধ করা রীতিমতো লাভজনক এবং ঠিকভাবে অপরাধ করলে ধরা পড়ার বা শাস্তি পাওয়ার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই। আমরা যখন খবরের কাগজ খুলতে ভয় পাই তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে বসলেন সন্ত্রাস নিয়ে এই দেশের মানুষের কোনো আতঙ্ক নেই—খানিকটা অস্বস্তি থাকতে পারে (প্রথম আলো, ৪ মার্চ)। নিম্ন শ্রেণীর কিছু প্রাণী আছে যাদের স্নায়ুতন্ত্র নাকি উন্নত নয় বলে তারা নাকি তীব্র বেদনা অনুভব করতে পারে না, তাদের কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও তারা নাকি তীব্র যন্ত্রণার বদলে মৃদু অস্বস্তি অনুভব করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য পড়ে

আমার সেই কথাটি মনে পড়ল, তিনি সম্ভবত আমাদের সব মানুষকেই নিচু শ্রেণীর প্রাণী বলে মনে করেন—তাদের যেন ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা পাওয়ার, আতঙ্কিত হওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই, বড় জোর মৃদু এক ধরনের অস্বস্তি অনুভব করে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি নিজেকে মহিমার বাবার জায়গায় বসিয়ে কখনও কল্পনা করতেন যে তার মহিমা নামে একটা কিশোরী মেয়ে আছে, এলাকার কিছু দুর্বৃত্ত তার সেই মেয়েটিকে কিছু একটা করে ফেলবে বলে ভয় দেখিয়েছে সেটা নিয়ে তিনি সর্বক্ষণ আতঙ্কে থাকেন এবং এক দিন সত্যি সত্যি সেই দুর্বৃত্তরা তার মেয়েকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ করে জানিয়ে দিল তারা সেই অবমাননার ছবিটি তুলে বাজারে সবাইকে দেখিয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি তার মেয়ের সেই নিদারুণ অবমাননার কষ্ট বুকে চেপে রেখে সেই ধর্ষকদের দোরে দোরে ঘুরে সেই ছবি ফেরত চাইতেন, দেশের আইন যদি তাকে কোনো রকম নিরাপত্তা না দিত এবং এক দিন ঘরে ফিরে এসে তিনি যদি বলতেন তিনি সেই ছবিগুলো ফিরিয়ে আনতে পারেননি, তার কিশোরী মেয়েটি যদি পর দিন বিষের পাত্র মুখে তুলে আত্মহত্যা করত তখন তিনি কী শুধু মৃদু অস্বস্তি অনুভব করতেন নাকি তার বুকের ভেতর অন্য কোনো ধরনের অনুভূতি কাজ করত—সেটি আমার খুব জানার ইচ্ছে করে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভালোবাসাহীন অপ্রয়োজনীয় বক্তব্যে আমরা যখন প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি তখন দেশের প্রধানমন্ত্রীও সন্ত্রাস নিয়ে তার বক্তব্যটি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন দেশের সকল সন্ত্রাস আসলে বিরোধী দলের তৈরি। আমার জানা মতে, এটি হচ্ছে সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে ভয়াবহ একটি কথা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই এটি বিশ্বাস করেন তা হলে ধরে নিতে হবে তিনি কোনো সংবাদপত্র পড়েন না, দেশে কী হচ্ছে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই, কোনো কৌতূহলও নেই। কিছু চাটুকার তাকে ঘিরে রেখে এই দেশ সম্পর্কে আজগুবি এবং উদ্ভট কিছু ধারণা দিচ্ছে এবং তিনি সেটা বিশ্বাস করছেন। আর প্রধানমন্ত্রী যদি কথাটি বিশ্বাস না করে থাকেন, শুধু বলতে হয় বলে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে তার সরকারের সন্ত্রাস দূর করার সত্যিকারের কোনো ইচ্ছে নেই। সন্ত্রাসী কে সেটা খুব ভালো করে জেনেই তিনি এ কথা বলে বলে তাদেরকে অভিযোগ থেকে রেহাই দিয়েছেন, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন।

কোনো একটি সমস্যা দূর করার প্রথম ধাপ হচ্ছে সেটা বোঝা। যে সমস্যার কথা সরকারের কেউ বুঝতেই রাজি নয়, সেই সমস্যাটি কেমন করে দূর হবে?

৪.

আমাদের চারপাশে এত অন্যায়, এত অপরাধ, খবরের কাগজ খুললেই এত মন খারাপ করা ভয়াবহ ছবি যে সবকিছু দেখে আমরা সবাই ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। আমরা সবাই এখন ভালো একটা কিছু, সুন্দর একটা কিছু দেখার জন্য বুভুক্ষুর মতো অপেক্ষা করে থাকি। চারপাশের অন্যায়-অত্যাচার আর অবিচার নয়, আমি ভয় পাই সম্পূর্ণ অন্য একটি জিনিস দেখে—আমাদের নতুন প্রজন্ম কি এসব দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে? তারা কি ভাবছে পৃথিবীর মানুষ আসলে খারাপ, স্বপ্ন দেখার শক্তি কি তারা হারিয়ে ফেলছে? ভবিষ্যতের কথা ভাবলে তাদের কি মনে হয় পঙ্কিল একটা সমাজে তাদের দুর্গন্ধময় কিছু মানুষের সঙ্গে বেঁচে থাকতে হবে? তারা কি মনে করে বেঁচে থাকার জন্য সুন্দর একটা জীবন দূরে থাকুক সেটার স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা থেকেও কি তাদেরকে আমরা বঞ্চিত করেছি?

আমরা যারা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়টির ভেতর দিয়ে এসেছি আমরা খুব সৌভাগ্যবান। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের চেলাচামুণ্ডা রাজাকার আলবদর জামায়াতে ইসলামীর লোকজন মিলে এই দেশে যে অমানুষিক নির্যাতন আর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল আমরা সেটা নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে সেই বিভীষিকা থেকেও ১০০ গুণ বেশি উজ্জ্বল হয়ে যেটা বেঁচে আছে সেটা হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ আর মহানুভবতা।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদের সময় মানুষের সত্যিকারের রূপটি বের হয়ে আসে, জাতির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্দিনে আমরা মানুষের প্রকৃত রূপটি দেখেছি— সেটি ছিল সাহসের, আত্মত্যাগের এবং ভালোবাসার। মানুষের সেই রূপটি আমাদের হৃদয়ে এত গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে যে, আমরা কখনো মানুষের ওপরে বিশ্বাস হারাই না—আমরা জানি, এই দেশের সাধারণ একজন মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষদের একজন। অল্প কিছু দুর্বৃত্ত, সমাজের খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ কলুষিত হয়ে পুরো সমাজটাকে আঁকড়ে ধরেছে। তাই আমরা সবসময় মানুষের একেবারে ভেতরের সৌন্দর্যের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারি।

কিন্তু এই নতুন প্রজন্মের কী হবে? তারা কি মানুষের ভেতরকার সেই সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পেয়েছে? সেটি তো এখনো মানুষের ভেতরে আছে, আমরা তাহলে কেন নতুন প্রজন্মকে সেটি দেখানোর একটি সুযোগ করে দিই না? ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দিই না? মানুষের ভেতরে সেই মহত্ত্ব, সেই সৌন্দর্য, সেই ভালোবাসা সবই আছে—কিন্তু অল্প

কিছু মানুষের তৈরি কুশ্রী অসৌন্দর্যের জঞ্জাল ভেদ করে সেসব সামনে আসতে পারছে না। আমার কী যে ইচ্ছে করে খবরের কাগজে ভালো একটা খবর পড়তে যেখানে মানুষের মহত্ত্ব আর আত্মত্যাগের কথা বলা থাকবে। প্রথম আলোতে কত অসংখ্য খুন-জখম-রাহাজানির খবর ছাপা হয়েছে তার খুঁটিনাটি মনে নেই কিন্তু বহুদিন আগে ছাপা হয়েছিল বগুড়ার মোটরচালক সমিতি প্রতিবন্ধীদের জন্য অল্প মূল্যে বাসে চলাচলের সুযোগ করে দিয়েছে— সেই খবরটি আমার এখনো মনে আছে। আমরা বুভুক্ষু হয়ে আছি, মানুষের ভালো একটি খবর পড়ার জন্য। মানুষের ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য। নাটোরের মানুষ নিজেরা উদ্যোগী হয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র লাঠি-বাঁশি আর মনোবল নিয়ে সন্ত্রাসীর মূলোৎপাটন করতে শুরু করে দিয়েছেন সেই খবরটি কি আমাদের অনুপ্রাণিত করেনি? গণিত অলিম্পিয়াডে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নোত্তরে না জেনে শুধু নম্বর পাওয়ার লোভে সম্ভাব্য জায়গায় টিক দেয়নি—এই খবরটি পড়ে গর্বে আমাদের বুক কি ১০ হাত ফুলে যায়নি? এ রকম শত শত ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটছে, দুর্বৃত্তদের অত্যাচারের পাশাপাশি সেগুলো কি নিয়মিতভাবে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় আসতে পারে না?

আমাদের সবার জীবনেই তো ভালো কত কিছু ঘটছে, সেগুলো চেপে রেখে কেন আমরা শুধু অসুন্দরকেই প্রচার করে যাচ্ছি? সেদিন হঠাৎ দেখি বাসের হেলপার রাস্তার মাঝখানে বাস থামিয়ে সবার বিরক্তির উদ্রেক করে এক থুরথুরে বুড়িকে ধরে রাস্তা পার করে দিচ্ছে। ট্রেনে আসার সময় আমার পাশে একজন কলেজের ছাত্রী বসেছিল, তার কাছে তার কলেজের একজন শিক্ষকের কথা শুনেছি যিনি শুধু তাকে নয় তার ক্লাসের সব ছেলেমেয়েকে সব অসুন্দর কুশ্রী পঙ্কিলতার ওপরে টেনে নিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়ে দিয়েছেন। আমি নিশ্চিত এ রকম অসংখ্য মানুষ সবার অগোচরে মানুষের ভেতরের সৌন্দর্যকে বিকশিত করে দিচ্ছেন—আমরা কি সেগুলোর কথা শুনতে পারি না, আমরা কি একজন আরেকজনকে সেটা মনে করিয়ে দিতে পারি না?

বাংলাদেশের মানুষ আজ বড় বুভুক্ষু। সুন্দর কিছুর জন্য, মহৎ কিছুর জন্য আমরা কাতর হয়ে পড়ছি—সবাই মিলে নতুন প্রজন্মকে সুন্দর কিছু দেখার সুযোগ করে দিন—স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দিন।

দৈনিক প্রথম আলো, ২৫/৩/০২

কত দীর্ঘ এই লং মার্চ?

তেল গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটি যখন ঠিক করেছিল যে তারা বিবিয়ানা পর্যন্ত একটা লং মার্চ করবে তখনই আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল যে সেটাতে যোগ দিই। কিন্তু আজকাল এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছি যে দৈনন্দিন রুটিন থেকে আট আটটি দিন বের করে ফেলা খুব সোজা ব্যাপার নয়। তাই ঠিক করে রেখেছিলাম লং মার্চ করে সবাই যখন বিবিয়ানা এলাকায় পৌঁছুবে তখন অন্তত সেখানে গিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করে আসব।

লং মার্চটি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি খবরের কাগজে তাদের অগ্রগতি লক্ষ করতে শুরু করেছিলাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আবিষ্কার করলাম। সেগুলো হচ্ছে (ক) এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কোনো মাথাব্যাথা নেই; (খ) সমর্থন দিয়েছে শুধু বাম দলগুলো; (গ) সংবাদপত্র এবং প্রচার মাধ্যমগুলো পুরো লং মার্চটিকে একটা গুরুত্বহীন ব্যাপার হিসেবে বিবেচনা করছে।

আমাদের দেশের এ ধরনের একমাত্র সম্পদ রক্ষা করার প্রচেষ্টাটুকু আমার কাছে একেবারেই গুরুত্বহীন নয়, তাই তেল গ্যাস রক্ষা কমিটি যখন তেরোই মার্চ বিবিয়ানা এলাকায় পৌঁছেছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক মিলে তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা প্রকাশ করতে গিয়েছিলাম। সিলেট শহর থেকে ঘণ্টাখানেক বাসে গিয়ে শেরপুরে পৌঁছে দেখি পথের পাশে একটা ছোট মঞ্চ করা হয়েছে। মঞ্চে নেতৃস্থানীয় মানুষেরা বসে আছেন—ওপরে একটা সামিয়ানা টানা আছে, অন্য সবাই প্রখর রৌদ্রে বসে আছে। আমার দেখে খুব ভালো লাগলো যে যারা বসে আছে তাদের বেশির ভাগই তরুণ-তরুণী। এরকম একটি ব্যাপারে আমাদের নতুন প্রজন্ম উৎসাহ দেখাচ্ছে সেটি খুব আশার কথা বলে মনে হলো।

আমরা পৌঁছানো মাত্রই কিছু বোঝার আগেই আমাকে এবং আমাদের প্রাক্তন উপাচার্য মোঃ হাবীবুর রহমানকে মঞ্চে তুলে দেওয়া হলো। সবাই কাঠফাটা রৌদ্রে বসে আছে, তার মাঝে আমরা ছায়াতে বসে আছি ভেবে একটু অপরাধবোধে ভুগছিলাম, আশেপাশে যারা এসেছেন যাদের অনেকের নাম

শুনেছি কখনো চোখে দেখিনি, তাদের সঙ্গে পরিচয় করছি ঠিক তখন শুনতে পেলাম একজন আমার নাম ঘোষণা করে বলে দিয়েছেন যে, আমি এখন বক্তৃতা দেব। আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তারা কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই যে কোনো বিষয়ে পঞ্চাশ মিনিট কথা বলতে পারি (আমাদের ক্লাসগুলো পঞ্চাশ মিনিটের—মাঝে মাঝে কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়া ক্লাস নিয়ে ফেলতে হয়!)—কিন্তু আজকের এটি অন্য একটি ব্যাপার। এটি একটি জনসভা, যারা বসে আছে তারা মুহুর্মুহু স্লোগান দিচ্ছে—আমি কিছু বলতে চাইলে সেই স্লোগানের উত্তেজনা ছাপিয়ে বলতে হবে! আমার আগে আরো দু-চারজন বক্তৃতা দিয়ে ফেললে তাদের কথা শুনে কিছু একটা বলা যেত। আমার সে সুযোগও নেই। কাজেই বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে আমি অন্য কিছু চেষ্টা না করে মনের কথাগুলোই বললাম, দেশের প্রতি গভীর মমতায় যারা সুদূর ঢাকা থেকে তিনশত কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে এখানে এসেছেন তাদের প্রতি আমার পক্ষ থেকে এবং দেশের মানুষের পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। লং মার্চ শুরু হবার পর জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী লং মার্চের উদ্যোক্তাদের আবেগ দিয়ে তাড়িত বলে উপহাস করেছিলেন। আমি শ্রোতাদের বললাম, দেশের জন্য ভালোবাসার যে আবেগ সেটিকে নিয়ে উপহাস করা যায় না—বাঙালির বুকের ভেতর এই গভীর আবেগ আছে বলে উনিশ'শ একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর যে বক্তব্যটি আমার সবচেয়ে বেশি খারাপ লেগেছিল সেটি হচ্ছে যে তেল গ্যাস রক্ষা কমিটির সদস্যরা নাকি গ্যাস সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আমি তার প্রতিবাদ করে বললাম জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী যদি সত্যিই তাদেরকে এতটা তাচ্ছিল্য করেন তা হলে তার উচিত তেল গ্যাস রক্ষা কমিটির যে-কোনো একজন সদস্যের সঙ্গে জাতীয় টেলিভিশনে সরাসরি বিতর্কে যোগ দেওয়া। দেশের মানুষ দেখুক কে এ সম্পর্কে বেশি জানে, দেশের জন্য কার মমতা বেশি।

আমি ভালো বক্তা নই—অন্যরা আমার থেকে অনেক সুন্দর করে বক্তৃতা দিলেন। আমি খুব আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করলাম তাদের বেশ কয়েকজন টেলিভিশনে সরাসরি বিতর্কের বিষয়টি গ্রহণ করে সেটাকে একটা সত্যিকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে সরকারের কাছে ছুঁড়ে দিলেন। (লং মার্চ শেষ করে জাতীয় তেল গ্যাস রক্ষা কমিটি এই চ্যালেঞ্জের কথা ভোলেননি, সংবাদ সম্মেলন করে তারা মন্ত্রী, আমলা, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং তাদের যে-কোনো অর্থনীতিবিদকে সরাসরি বিতর্কে আহ্বান জানিয়েছেন। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে দেখার জন্য অপেক্ষা করছি এই বিতর্কে অংশ নেবার মতো নৈতিক জোর আদৌ তাদের আছে কি না।)

সভা শেষে সবাই মিলে বিবিয়ানার পথে রওনা দিয়েছে। গ্রামের মেঠোপথে সবাই মিছিল করে হাঁটছে, তাদের হাতে রঙিন ফেস্টুন, ব্যানার আর পোস্টার। বিশাল ফাঁকা প্রান্তরের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা সড়ক, কুশিয়ারা নদীর তীর ঘেঁষে চলে গেছে। আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি মানুষের সেই মিছিলে অন্তত কয়েক কিলোমিটার লম্বা। গ্রামের মানুষজন রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে, বউঝিরা গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে, কোথাও হাত তালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে, কোথাও খাবার পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট শিশুরা পিছু পিছু ছোটাছুটি করছে—তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে আজ হঠাৎ করে এ কী উত্তেজনা!

বড় কোনো মিছিলে হাঁটার আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই। এমনিতে হাঁটতে বের হলে ক্লান্ত হলে ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেওয়া যায় কিন্তু এখানে বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। সবাই যে ছন্দে হাঁটছে আমাদেরকেও সেই ছন্দে হাঁটতে হবে। গ্রামের পথে হাঁটতে বের হলে কতটুকু হাঁটা হয়েছে বের করা খুব মুশকিল। কোনো এক বিচিত্র কারণে আমাদের গ্রামের মানুষ দূরত্বকে মাইল-কিলোমিটারে প্রকাশ করতে পারেন না। তবে আমার পকেটে একটা জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, উপগ্রহের সিগনাল ব্যবহার করে অবস্থান বের করার একটি যন্ত্র) ছিল, সেটার হিসাব অনুযায়ী ঠিক সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার হাঁটার পর পুলিশ আমাদের থামিয়ে দিল। মিছিলটি পুলিশের বেষ্টনী ভেঙে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল না, কাছাকাছি একটা স্কুলের মাঠে একত্র হয়ে মুহুর্মুহু স্লোগানের মাঝে তাদের ঘোষণাপত্র পাঠ করল। আমরা খানিকক্ষণ বসে বিশ্রাম নিয়ে আবার ফিরে আসতে শুরু করলাম। অন্যরা আট দিন হেঁটেছে তিনশ কিলোমিটার—আমরা একদিনে হেঁটেছি মাত্র এগারো কিলোমিটার, কিন্তু তাতেই আমার মনে হতে লাগল, আমরা বুঝি বিশাল একটা কাজ করে ফেলেছি!

২.

ঘরকুনো মানুষ বলে এরকম দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার থেকে আমি দূরে থাকি, তবে গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারটি এই দেশের বিরুদ্ধে এমন ভয়ংকর একটি ষড়যন্ত্র যে এখন আর ঘরে থাকার সুযোগ নেই। আমার ধারণা সরকার যদি এটি বন্ধ না করে তা হলে আগে হোক পরে হোক সবাই ঘর থেকে বের হয়ে আসবে। ব্যক্তিগতভাবে লং মার্চের শেষ অংশটুকুতে থাকতে পারা আমার জন্য খুব চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা ছিল।

আমাদের দেশের সংবাদপত্র পড়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা থেকে বলতে পারি সংবাদপত্রের খবর হিসেবে এই লং মার্চটুকু অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি বিষয় ছিল। সংবাদপত্রের মানুষ যেসব জিনিস দেখতে পছন্দ করে এখানে তার সব কয়টি বিষয় ছিল কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই পুরো ব্যাপারটি নিয়ে সংবাদপত্রগুলো ছিল একেবারেই নিস্পৃহ। কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ সেই রঙিন এবং উদ্দীপ্ত তারুণ্যের মিছিলের ছবিটি বেশির ভাগ পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়নি। আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারি না ডেইলি স্টারের মতো সম্ভ্রান্ত একটি পত্রিকা এই ঘটনার সংবাদটুকু পর্যন্ত ছাপেনি।

ব্যাপারটি আমাকে খুব ভাবনায় ফেলেছে। সংবাদপত্রের কর্মচারী এবং সাংবাদিকরা নিশ্চয়ই আমাদের মতো সাধারণ মানুষ, কিন্তু সংবাদপত্রের মালিকরা নিশ্চয়ই বিত্তশালী মানুষ। সাধারণ মানুষ আর বিত্তশালী মানুষের স্বার্থ নিশ্চয়ই এক নয়। আমি নিশ্চিত বিবিয়ানা লং মার্চের এই বিশাল জাতীয় একটি ঘটনাকে বাংলাদেশের মানুষের চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখার ব্যাপারটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—এর নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। যারা খবরের কাগজের মালিক, বিশাল যাদের অর্থবিত্ত, কোনো-না-কোনো ভাবে নিশ্চয়ই এই গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারটির সঙ্গে, এ সম্পর্কে দেশের মানুষের সচেতনতার সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্ক আছে। কাজেই ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের কথা সম্ভবত সংবাদ মাধ্যমগুলোতে সেভাবে প্রচার করা হবে না। যারা গ্যাস রক্ষা করার জন্য পথে নামবেন তাদের সম্ভবত একটা দুরূহ পথ অতিক্রম করতে হবে, সেই পথে সংবাদপত্রের সাহায্য তেমন পাবেন না। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী সম্ভবত সেটি আগে থেকেই জানেন, পুরো ব্যাপারটি নিয়ে তাই বুঝি তার এত তাচ্ছিল্য, এত অবজ্ঞা।

৩.

বিবিয়ানা লং মার্চে যোগ দিয়ে আরো একটি ব্যাপার নিয়ে আমি এক ধরনের নস্টালজিয়া অনুভব করেছি। আমাদের চারপাশে বর্তমান ছাত্রনীতির কলুষিত রূপটি দেখে আমাদের সবার মন বিষিয়ে গেছে। ছাত্ররা যখন তাদের তারুণ্যের শক্তিটুকু ব্যয় করে কেন্টিনে 'ফাও খাওয়ার জন্য', 'রিকশাওয়ালার থেকে চাঁদা তোলার জন্য' বা 'ছিনতাই করা টাকা ভাগাভাগি করতে মারামারি করার জন্য'—তখন লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। কিন্তু এই লং মার্চে এসে আমি অসংখ্য তরুণ-তরুণীকে দেখেছি যারা নিশ্চয়ই এই দেশের

নানা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। দেশের সম্পদ রক্ষা করার জন্য নিজেদের রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে শক্তি পেয়ে তারা তিনশত কিলোমিটার হেঁটে চলে এসেছে, আদর্শের পথ ধরে চলে আসা সুশৃঙ্খল একটি দল—আমাদের ছাত্রজীবনে আমরা যেরকমটি দেখেছিলাম। সেটি দেখে আমি এক ধরনের নস্টালজিয়া বোধ করেছি। দেশের পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আমি অনেকবার ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছি—কিন্তু লং মার্চে এসে আত্মত্যাগী পরিশ্রমী সুশৃঙ্খল, দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থাকা এই ছাত্রছাত্রীদের দেখে মনে হয়েছে আমরা কি আবার ষাট এবং সত্তর দশকের আদর্শবান তেজস্বী ছাত্রছাত্রীদের ফিরে পেতে পারি না?

৪.

গ্যাস বিক্রি করার একটা অযৌক্তিক প্রস্তাব তুলে সারা দেশে একটা বিতর্ক তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে, আমার মনে হয় প্রস্তাবটি যে কত অর্থহীন সেটা বোঝার জন্য সবারই কয়েকটি সংখ্যার কথা জানা উচিত।

প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে এক হাজার কোটি। বর্তমান প্রস্তাব অনুযায়ী গ্যাস রপ্তানি করা হলে বাংলাদেশ বছরে এক হাজার কোটি টাকা পাবে। আমরা যারা গুনে গুনে টাকা খরচ করি, দরদাম করে রিকশায় উঠি তাদের কাছে এক হাজার কোটি টাকা অনেক বেশি মনে হতে পারে কিন্তু একটা দেশের জন্য এক হাজার কোটি টাকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা সংখ্যা। সংখ্যাটি কত ছোট বোঝানোর জন্য সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে, বাংলাদেশে বছরে বিদ্যুৎ আর গ্যাস চুরিই হয় (System loss) এক হাজার একশ কোটি টাকার। সরকার যদি শুধু তার দায়িত্ব পালন করে বিদ্যুৎ আর গ্যাস চুরি বন্ধ করতে পারে তা হলেই বছরে গ্যাস রপ্তানির এক হাজার কোটি টাকা উঠে গিয়েও একশ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। এরকম একটা অবস্থায় যে কাজটি করা উচিত সেটি না করে কেন দেশকে সর্বস্বান্ত করার একটা ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে দেব?

গ্যাস বিক্রি করে যে এক হাজার কোটি টাকার লোভ দেখানো হচ্ছে সেটা যে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা সংখ্যা সেটা বোঝানোর জন্য সবাইকে আরো মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে, আমাদের সামরিক আর অন্যান্য অনুৎপাদনশীল খাতে বছরে খরচ হয় প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা— সেখানে যদি দশ ভাগের এক ভাগও বাঁচানো যায় তা হলেই গ্যাস বিক্রির দেড়গুণ টাকা উঠে আসে। শুধু তাই নয়, এই দেশে বছরে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার কোটি কালো টাকা

তৈরি হয়, সরকার যদি শুধু ভালো ভালো বক্তৃতা না দিয়ে এই কালো টাকার শতকরা দুই ভাগও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা হলেই গ্যাস রপ্তানির সমান টাকা পাওয়া যাবে। আমি অর্থনীতিবিদ নই—এই সংখ্যাগুলো নিয়েছি ডিসেম্বরের ৮ তারিখে এলজিইডি ভবনে পঠিত ড. আবুল বারকাতের প্রবন্ধ থেকে। সেখানে এর চাইতেও চমকপ্রদ তথ্য আছে— দেশের সাধারণ মানুষের সেগুলো জানা খুব দরকার। 'গ্যাস বিক্রি' 'গ্যাস বিক্রি' বলে সরকার হঠাৎ করে যেভাবে খেপে উঠেছে সেটা থেকে অনেকের ধারণা হতে পারে ব্যাপারটি বুঝি আমাদের দেশের জন্য একটি বিশাল ব্যাপার—এটি করে দিলে টাকায় টাকায় দেশ সয়লাব হয়ে যাবে—আসলে সেটি একেবারেই সত্যি নয়। টাকার পরিমাণটি কম—এত কম যে সেটা নিয়ে আদৌ কেউ মাথা ঘামাচ্ছে সেটাই হচ্ছে আমাদের বিস্ময় এবং সন্দেহের কারণ। তার চাইতেও বড় কথা বাংলাদেশের সঙ্গে বিদেশী তেল কোম্পানিগুলোর যে চুক্তি করা হয়েছে, সেখানে পাইপ লাইন বসিয়ে গ্যাস বিক্রি করার কথা লেখা নেই, তা হলে হঠাৎ করে তাদের চুক্তির বাইরে একটা সুবিধে দেওয়ার জন্য সবাই উঠেপড়ে লেগেছে কেন? আমরা ঘরপোড়া গরু—তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাই। অতীতে বিদেশী কোম্পানিদের খুশি করার জন্য আমাদের দেশের স্বার্থ পুরোপুরি বিসর্জন দেওয়ার এতগুলো উদাহরণ দেখেছি (সিমিটার, মাগুরছড়া, কাফকো) এবং এ ব্যাপারে সকল সরকারই এক রকম, তাই আমরা এক ধরনের আতঙ্কের মাঝে আছি। অতীতের উদাহরণ দেখে বলে দেওয়া যায় এই সরকার যদি গ্যাস বিক্রির এই ষড়যন্ত্র সত্যি সত্যি কোনোভাবে কাজে লাগিয়ে ফেলে তা হলে ভবিষ্যতে নতুন কোনো ষড়যন্ত্র হবে না সেটি কে বলতে পারে? আজ থেকে চার-পাঁচ বছর পর হয়তো দেখা যাবে বিদেশী তেল কোম্পানির ধুরন্ধর আইনজীবীদের কৌশলী শব্দচয়নের কারণে আমরা গ্যাস বিক্রির কোনো টাকা তো পাবই না, বরং নিজেদের পকেটের টাকা ভতুর্কি দিয়ে সেই গ্যাস দিল্লিতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হচ্ছে!

৫.

আমাদের সংবিধান বলেছে বাংলাদেশের এই গ্যাসসম্পদের মালিক দেশের মানুষ, সেই হিসেবে গ্যাসসম্পদে আমারও নিজের খানিকটা মালিকানা আছে। মানুষের বাড়িঘর জমিজিরাত এরকম নানা ধরনের সহায়সম্পদ থাকে, আমার সেরকম কিছু নেই, বলা যেতে পারে গ্যাসের মালিকানায় আমার অংশটুকু হচ্ছে আমার একমাত্র স্থাবর সম্পত্তি! রাস্তার টোকাই শিশু, রিকশাওয়ালা এবং

গ্রামের চাষীরও তাতে সমান অধিকার এবং মাননীয় জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীরও তার অংশের বাইরে এক সিএফটি গ্যাস বেশি নেই। যে সম্পদটুকু আমার সেটি যদি আর কেউ বিক্রি করে দেওয়ার কথা বলে তা হলে আমাদের ক্রুদ্ধ হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় একজন দুর্বৃত্ত যদি আমার মানিব্যাগ ছিনতাই করে নেয়, তার সঙ্গে এই গ্যাস বিক্রি করার কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। এর মালিক আমরা এবং আমরা এটি বিক্রি করার অনুমতি দিইনি। কাজেই এই গ্যাস বিক্রি করা হবে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে বিক্রি করা। পাইপ লাইন বসিয়ে গ্যাস বিক্রির কথাটি নির্বিচনী ইশতেহারে ছিল না, কাজেই এই সরকারের গ্যাস বিক্রি করার কোনো নৈতিক বা আইনগত অধিকার নেই। কিছু ভাড়াটিয়া বিশেষজ্ঞের কথায় তারা গ্যাস বিক্রি করতে পারবে না—একান্তই যদি এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে চায় তা হলে তারা গণভোটের ব্যবস্থা করবে! যতদিন এই গণভোটের ব্যবস্থা না করা হচ্ছে অনুগ্রহ করে এই ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া হবে বুদ্ধিমানের কাজ এবং গ্যাস বিক্রি করার পরিকল্পনাটি পুরোপুরি পরিত্যাগ হবে দেশপ্রেমিকের কাজ। গ্যাস বিক্রি বন্ধ করতে একটি দীর্ঘ লং মার্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন আমরা সবাই জানতে চাই কত দীর্ঘ হবে এই বিবিয়ানা লং মার্চ?

দৈনিক প্রথম আলো, ৬/৪/০২

লালসালুর আড়ালে

১.

সেদিন দুপুর বেলা আমার কাছে ফোন করে আমার এক ছাত্র বলল যে সিলেট শহরের ডিসি এবং এসপি মিলে লালসালু ছায়াছবিটির প্রদর্শনী বন্ধ করে দিয়েছেন। ছাত্রটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম সোসাইটির একজন সদস্য এবং তারা খুব উৎসাহ নিয়ে লালসালু ছায়াছবিটি সিলেটে এনেছে। অডিটরিয়ামের ভাড়া ইত্যাদির জন্য অনেক টাকা-পয়সা খরচ হয়েছে—হঠাৎ করে প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়ায় তাদের বড় ধরনের সমস্যা হয়ে গেছে। কিন্তু ছাত্রটি ক্ষুব্ধ অন্য কারণে, সে জানতে চায় লালসালুর মতো একটি ছবির প্রদর্শনী এই দেশে কেমন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়?

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আবৃত্তি, নাটক, ফটোগ্রাফি, এস্ট্রোনমি ইত্যাদি হরেক রকমের সংগঠন আছে এবং তাদের প্রায় সবার সঙ্গে আমার কোনো-না-কোনো ভাবে যোগাযোগ আছে। আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে কয়টি মূল্যবান জিনিস আবিষ্কার করেছি তার একটি হচ্ছে যে, পৃথিবীতে সকল মানুষকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ মানুষ নিজের জন্য বেঁচে থাকে। তারা ব্যক্তিগত জীবনে সময় সময় খুব সফল হয়। অর্থ, বিত্ত, সুখ ইত্যাদি বিষয় খুব সহজে তাদের হাতে ধরা দেয়। অন্য ভাগের মানুষগুলো তাদের জীবনের বড় একটা অংশ খরচ করে অন্যের জন্য। তারা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে মাথা ঘামায়, তারা নানা ধরনের সংগঠন করে, বন্যার সময় বানভাসী মানুষের জন্য রিলিফ নিয়ে যায়। দেশের তেল গ্যাস বাঁচানোর জন্য লং মার্চ করে। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায় বলে অনেকেই তাদের খানিকটা ভিন্ন চোখে দেখে। তবে আমি মোটামুটি বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করেছি যে, দেশ জাতি বা সমাজকে যারা বড় হাতে কিছু একটা দিয়েছে তারা সবাই এই দ্বিতীয় ধরনের মানুষ। ছাত্রজীবনে তারা সবাই বাবা-মায়ের বকুনি খেয়েছে, তাদের দুশ্চিন্তার উদ্রেক করেছে, তার পরেও সব সময় দশটা কাজে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে। এই দেশে ছাত্র রাজনীতি যখন দেশপ্রেমের সঙ্গে সমার্থক ছিল তখন তারা ছাত্র রাজনীতি করেছে। আজকাল ছাত্র রাজনীতির কাছে যেতে পারে না বলে তারা শিল্প-

সাহিত্য-সংস্কৃতির কাছাকাছি নানা ধরনের সংগঠন করে। সে কারণে আমি সব সময় আমার ছাত্রছাত্রীদের এই ধরনের কাজ করে নিজেদের সৃজনশীল বা সাংগঠনিক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উৎসাহ দিই। তারা নিজেরা নিজেরা যখন কিছু একটা করে ফেলে সেটা দেখে আমি নিজেও এক ধরনের উৎসাহ পাই।

তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের ফিল্ম সোসাইটি যখন লালসালু ছবিটি সিলেট শহরে দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল তখন আমি মনে মনে খুব উৎসাহিত হয়েছিলাম। এটি বাংলাদেশের একটি ক্লাসিক উপন্যাস, সেই পাকিস্তান আমলেও এটা সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য পাঠ্য ছিল। বাংলাদেশের খুব কম মানুষই আছেন যিনি এই বইটি পড়েননি এবং বইয়ের চরিত্রগুলোর সঙ্গে এক ধরনের একাত্মতা বোধ করেননি। স্বনামধন্য তানভীর মোকাম্মেল এটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের মানুষেরা খুব আগ্রহ নিয়ে এই ছায়াছবিটি দেখছে। ঢাকা শহরে প্রতিদিনই হাজারো রকমের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ঘটে—সিলেটের মতো মফস্বল শহরে তার ছিটেফোঁটাও হয় না। লালসালু ছবিটি এনে আমার ছাত্ররা এ রকম একটি ক্লাসিক উপন্যাসের চমৎকার একটি চিত্রায়ণকে সিলেটের সবার জন্য দেখার সুযোগ করে দিল। আমি নিজেও ছবিটি এখনো দেখার সুযোগ পাইনি এবং আগ্রহ নিয়ে সেই সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে আছি। তাই আমার ছাত্রটি যখন টেলিফোন করে আমাকে জানাল যে ছায়াছবিটির প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তখন আমি একটি বড় ধরনের ধাক্কা খেলাম কিন্তু কেন জানি খুব বেশি অবাক হলাম না। লালসালু বইয়ের কাহিনী একজন মৌলবাদী মানুষের কাহিনী—মৌলবাদের আসল চেহারা যখন একজন সাহিত্যিক সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলেন এবং একজন চলচ্চিত্রকার সেটাকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন সেটি কারো কারো কাছে খুব বেশি বিপজ্জনক মনে হতে পারে। ধর্মীয় উন্মাদনা ব্যবহার করে মারমুখো কিছু মানুষকে দিয়ে সাধারণত এই ধরনের প্রদর্শনীকে বন্ধ করা হয়। লাঠিসোটা হাতে এসে তারা সাধারণত এ ধরনের আয়োজন ভণ্ডুল করে এবং তখন পুলিশ দূর থেকে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। পরদিন পত্রপত্রিকায় পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা বের হয় কিন্তু সেটা নিয়ে কেউ গা করে না। পুলিশ অফিসাররা আজকাল রুটিনমাফিক তাদের হেফাজতে থাকা মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলছেন—তার তুলনায় তুচ্ছ দায়িত্বে অবহেলা জাতীয় ব্যাপারগুলো নিয়ে আর কে মাথা ঘামায়?

লালসালুর প্রদর্শনী বন্ধ করার ব্যাপারে আমার যে ব্যাপারটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেটি হচ্ছে যে, ধর্মোন্মত্ত মারমুখো কিছু মানুষ লেলিয়ে

দিয়ে এটি বন্ধ করা হয়নি, এটি বন্ধ করেছে ডিসি এবং এসপি। তারা সরকারি মানুষ, তারা সরকারের ক্ষমতা ব্যবহার করে বাংলাদেশের একটি ক্লাসিক উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণকে প্রদর্শিত হতে দিল না। যার অর্থ এটি কিছু ধর্মোন্মত্ত মানুষের কাজ নয়—খুব চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া সরকারি কাজ।

প্রশ্ন হচ্ছে লালসালু ছবিটির প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়া হলো কেন? ফিয়ের বিনিময়ে ছবি দেখানো যাবে না—এই ধরনের একটি খোঁড়া যুক্তি দিয়ে আমাদের ছাত্রদের পুলিশ স্টেশনে নিয়ে কাগজে তাদের স্বাক্ষর নিয়ে রাখা হয়েছে। প্রয়োজন হলে ফি ছাড়াই ছবিটি দেখানো হবে বলার পর পুলিশ সুপার পুলিশি ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'লালসালুর নাম মুখে নেবেন না। এটি সিলেটে দেখানো যাবে না।'

ডিসি এবং এসপি কী যুক্তি দিয়েছেন সেটি জানার জন্য আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। কারণ আমরা সবাই আসলে প্রকৃত ব্যাপারটি জানি। লালসালু মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লেখা একটি কাহিনী। মৌলবাদীদের প্রতি গভীর মমতা—এ রকম খুব শক্তিশালী লোক এই সরকারের মাঝে আছে। এই মানুষগুলো ওপর থেকে কলকাঠি নেড়েছেন এবং ক্ষমতাহীন দুর্বল এবং ভীরু ডিসি ও এসপি সেই হুকুম তামিল করেছেন। ডিসি এবং এসপি ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারেন—মাত্র গত সপ্তাহে আমরা রাজবাড়ীতে একটি গণিত উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সেখানকার তেজস্বী একজন মহিলা ডিসি এবং উৎসাহী তরুণ এসপিকে দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ছি, ছোট বাচ্চাদের অঙ্কে উৎসাহী করার জন্য তারা ছুটির দিনে তাদের কাজকর্ম ফেলে চলে এসেছিলেন। কিন্তু সিলেটে সে রকম ডিসি এসপি নেই—দেশের সংস্কৃতি সাহিত্য নিয়ে তাদের বুকের ভেতরে কোনো মমতা নেই। 'খাইছি তোরে', 'ডিস্কো বাইদানী' ছায়াছবি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই—কিন্তু লালসালু নিয়ে তাদের অনেক সমস্যা। ওপর থেকে শক্তিশালী মৌলবাদী কোনো মানুষ তাদের হুকুম করেন, তারা নতশিরে সেই হুকুম পালন করেন। সম্ভবত না করে উপায় নেই—এই সরকারের মাঝে শক্তিশালী মৌলবাদীদের উত্থান ঘটতে শুরু করেছে।

ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউতে (এবং ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে) এ রকম একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে এবং সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে সেই সংখ্যাটি বাংলাদেশে বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছে। সেই প্রতিবেদনে কীসব মিথ্যে কথা বলা হয়েছিল?

২.

সরকার ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউয়ের সেই সংখ্যাটি এই দেশে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু তার আগেই ইন্টারনেটে সেটি সবার পড়া হয়ে গেছে। প্রতিবেদনটির জন্য সরকার অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিল কিন্তু ক্রোধান্বিত হওয়ার কথা আসলে দেশের মানুষের। এই দেশের মানুষের মতো অসাম্প্রদায়িক এবং সহনশীল মানুষ পৃথিবীতে নেই কিন্তু তার পরও সারা পৃথিবীতে তাদের মৌলবাদী হিসেবে পরিচিত হতে হলো। শুধু যে মৌলবাদী হিসেবে পরিচিত হয়েছে তা নয়, বড়লোকের বাড়িতে যেভাবে লেখা হয় 'কুকুর হইতে সাবধান' ঠিক সে রকম করে লেখা হলো 'বাংলাদেশ থেকে সাবধান'। এটি দেখে কি নিজের মুখে নিজে আগুন দিতে ইচ্ছে করে না?

সরকার ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউয়ের বিরুদ্ধে কেস করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। দরিদ্র দেশের কোটি কোটি টাকা খরচ করে একটি বিদেশী ম্যাগাজিনের বিরুদ্ধে কেস করার জন্য আইনজীবীদের পেছনে টাকা ঢালার আগে তাদের কয়েকটা সহজ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

প্রতিবেদনের প্রথম কথাটিই ছিল এই দেশে মৌলবাদীর উত্থান হয়েছে কথাটি সত্যি কি না বোঝার জন্য রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না, খবরের কাগজ পড়তে জানলেই হয়। বর্তমান সরকার যাদের নিয়ে জোট করেছে তাদের একটি দলের নাম জামায়াতে ইসলামী—যে দল স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই দেশে গণহত্যা করেছে। স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে তারা এই দেশের ডাক্তার-বুদ্ধিজীবী-শিক্ষক-সাংবাদিক-ইঞ্জিনিয়ারদের হত্যা করে জাতিটিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। জোটের আরেক শরিক ছিল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি—যে ব্যক্তিটি আমাদের সংবিধানে সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকারের নিশ্চয়তাটুকু সরিয়ে ইসলাম ধর্মকে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে ঘোষণা করিয়েছেন। এটি নিজের ধর্মের প্রতি ভালোবাসা থেকে হয়নি কারণ, আমরা তার চরিত্রের যে বর্ণনা শুনতে পাই আর যাই হোক মুসলমান ধর্মে তার স্থান থাকার কথা নয়। নির্বাচনের আগে আগে জোট ভেঙে তিনি আরেকটি উগ্র মৌলবাদী দলের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন। নির্বাচনী জোটের চতুর্থ দলের নেতাকে মসজিদের ভেতরে একজন পুলিশকে হত্যা করার সময় উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছিল। এ রকম একটি জোট যদি নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করে তখন যদি কোনো বিদেশী সাংবাদিক সন্দেহ প্রকাশ করে এই দেশে মৌলবাদীর উত্থান ঘটছে তাকে কি দোষ দেওয়া যায় ?

প্রতিবেদনের আরেকটি বিষয় ছিল ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং হিন্দুদের দেশ ছেড়ে যাওয়া। নির্বাচনের পর খবরের কাগজে এখন পর্যন্ত যেসব খবর ছাপা হয়েছে শুধু সেগুলো পড়লে এই ব্যাপারে কারো মনে এতটুকু সন্দেহ থাকবে না। আমরা যারা এই দেশে থাকি তারা জানি যে দেশের সাধারণ মানুষ একেবারেই সাম্প্রদায়িক নয়, কিছু দুর্বৃত্ত এই অঘটনগুলো ঘটিয়েছে কিন্তু সেই দুর্বৃত্তদের শাস্তি না দিলে তার দায়দায়িত্ব কি আমাদের সবার ওপরে পড়ে না?

প্রতিবেদনটিতে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলা হয়েছে। কবি শামসুর রাহমানকে হত্যা করতে চেষ্টা করার সময় আমরা একবার এই দেশে আন্তর্জাতিক চক্রের খোঁজ পেয়েছিলাম। বিন লাদেনের কোটি কোটি টাকা এই দেশের অনেক মাদ্রাসাতে রিক্রুটিং আর ট্রেনিংয়ের জন্য খরচ হয় এ রকম খবরও অনেকবার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। অনেক মানুষকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল কিন্তু তারপর কী হয়েছিল আমরা জানি না। এই দেশে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের জমাট কাজকর্ম থাকার আশঙ্কাটি যে পুরোপুরি রয়েছে সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউয়ে হঠাৎ করে তৈরি করা অসংখ্য মাদ্রাসার বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের বড় বড় মৌলবাদী নেতারা কেউই তাদের নিজের ছেলেমেয়েদের ভুলেও মাদ্রাসায় পড়তে পাঠান না কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তারা অনায়াসে মাদ্রাসার এই দরিদ্র ছেলেগুলোকে লেলিয়ে দেন। প্রতিবেদনে মধ্যবিত্তের ঔদাসিন্য, দারিদ্র্য এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতির কথা বলা হয়েছে। এর কোনোটিই অসত্য নয়—বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারটি একটা ভয়াবহ পর্যায়ে চলে এসেছে। পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে এ রকম সন্ত্রাসীরা রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচন করছে—আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সারা পৃথিবীতে আর কোথাও এই ঘটনাটি ঘটেনি।

প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, মৌলবাদীদের এই অপশক্তিকে প্রতিরোধ করার শক্তি বা ইচ্ছে কোনোটাই সরকারের নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এর চেয়ে বড় সত্যি কথা আর কিছু হতে পারে না।

ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউয়ের লেখাটি পড়ে মন খারাপ হয়ে যায়—কারণ সেটি অত্যন্ত বাজে ভাষায় লেখা হয়েছে কিন্তু তারা কবে আর আমাদের জন্য সম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করেছে? তবে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ হওয়ার পর আমাদের ঢাকাবাসী বুদ্ধিজীবী এবং সম্পাদকদের প্রতিক্রিয়া পড়ে আমি খুব অবাক হয়েছি, তারা এই প্রতিবেদনের পুরোটুকুই অসত্য

প্রচারণা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ তারা যেন ঢাকা শহরের নিরাপদ বেষ্টনী থেকে বের হয়ে মাঝে মাঝে মফস্বলে আসেন, তা হলে তারা অবাক হয়ে আবিষ্কার করবেন যে এই দেশে অনেক জায়গা আছে যেখানে এখনো লালসালু দেখানো যায় না!

৩.

সিলেট অডিটরিয়ামে লালসালু নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পরদিন আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তারা আমাকে জানিয়েছে যে, এসপি এবং ডিসির ছলবল কৌশলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তারা রাতে শহীদ মিনারে হাজার হাজার মানুষকে লালসালু দেখিয়েছে। আরো হাজার হাজার মানুষ ছবিটি দেখার জন্য খুব ব্যস্ত। মৌলবাদীদের নিয়ে কী এই কাহিনী যেটা দেখাতে সবার এত ভয় সেটি জানার জন্য সবার খুব কৌতূহল। আবার কবে ছবিটি এখানে আসবে সেটি নিয়ে সবার এক ধরনের কৌতূহল—সোজা বাংলায় এটাকে বলে বুমেরাং। এমনিতে কতজন মানুষ সময় করে ছবি দেখতে যেতে পারে কিন্তু এবারে সবাই লালসালু দেখে ছাড়বে!

আমরা সাধারণত নিজেদের খুব গালমন্দ করি। নিজেদের নানা দোষত্রুটি নিয়ে সব সময় সমালোচনা করি, অপদার্থ জাতি বলে মাঝে মাঝে নিজেদের অভিশাপ দিই—কিন্তু তার পরও আমার ব্যক্তিগত ধারণা, জাতি হিসেবে আমরা অত্যন্ত চমৎকার। এবারের পয়লা বৈশাখ হচ্ছে সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

পয়লা বৈশাখ নিয়ে সবার মনে একটা ভয় ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য রমনার বটমূলে বোমা ফাটিয়ে এক ধরনের অমানুষিক নৃশংসতায় কিছু মানুষকে হত্যা করা হলো। এবারেও পয়লা বৈশাখ আসার আগে বায়তুল মোকাররমের খতিব এবং তার মতো আরো ধর্ম ব্যবসায়ীরা বাংলা নববর্ষকে ইসলামবিরোধী বলে ফতোয়া দিতে শুরু করল।

সাধারণ মানুষ বাইরে সে রকম কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না—খবরের কাগজে দু-চারটি দায়সারা বিবৃতিমাত্র এসেছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে সম্পূর্ণ অন্য একটি ব্যাপার ঘটে গেল। বাংলাদেশের সব মানুষ যেন পণ করে এ বছরের বাংলা নববর্ষ পালন করার জন্য পথে নেমে এল! অন্য বছর যারা ব্যাপারটি নিয়ে মাথা ঘামায় না এ বছর তারাও নববর্ষের আনন্দোৎসবে যোগ দিতে চলে এসেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরাও এবারে বাঙলা নববর্ষ পালন করল অনেক উৎসাহ নিয়ে, একদিন নয় দু'দিন নয়—তারা তিন দিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফেলল। পত্রপত্রিকাগুলো বিশেষ সংখ্যা বের

করল, অন্যরকম উৎসাহে বিশেষ বৈশাখী সংখ্যা প্রায় ঈদ সংখ্যার মতো আকার নিয়ে ফেলেছে। সারা দেশের পথেঘাটে মেলা এবং উৎসব। যারা চোখ মেলে দেখেছে তারা অনুভব করেছে এটি আমাদের হাজার বছরের উৎসব—দু-চারটি মৌলবাদীর বোমা আর ফতোয়া দিয়ে এটি কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এবারকার বাংলা নববর্ষ পালন করার এই আশ্চর্য উৎসাহটি কিন্তু এসেছে একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে—এটি কেউ পরিকল্পনা করে দেয়নি। দেশের মানুষ একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি, কথা বলেনি, সংগঠিত হয়নি। যখন দেখেছে একেবারে তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে অশুভ অপশক্তি হাত দিতে আসছে—তাদের সেই উদ্যত থাবাকে প্রতিরোধ করতে সবাই এগিয়ে এসেছে।

আমাদের দেশ নিয়ে, দেশের মানুষ নিয়ে অনেকে নানা দুর্ভাবনা করেন কিন্তু আমি কোনো দুর্ভাবনা করি না। এই দেশের মানুষ ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে কখনো ভুল করে না।

দৈনিক প্রথম আলো, ৩/৫/০২

কেউ কি আমাকে বুঝিয়ে দেবেন?

১.

৩০ মে প্রথম আলো পড়ে জানতে পারলাম বুয়েট ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানের স্মরণিকাতে লেখা সম্পাদকীয় পড়তে গিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক রেগে সেটা 'ছুড়ে' ফেলে দেন এবং সেটি নিয়ে 'তিরস্কার' করেন। প্রথম আলো জানিয়েছে, তার আপত্তির অংশটুকুতে লেখা আছে, 'লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মূল্যবোধ আজ ভূলুণ্ঠিত। একাত্তরের ঘাতক পাক বাহিনীর দোসর আজ সংগঠিত হয়ে রাষ্ট্রীয় পদসমূহ দখল করছে। আমাদের প্রিয় শিক্ষাঙ্গনে যেন এদের ছায়া না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।'

আমাদের দেশের মন্ত্রীরা মনে হয় একটু অন্যরকম। গত সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু একটি ট্রেন দুর্ঘটনা দেখতে গিয়েছিলেন, তার জুতোয় কাদা লেগে যাবে বলে চাটুকাররা তাকে কোলে করে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়েছিল। খবরের কাগজে চাটুকারদের কোলে বসা হাস্যোজ্জ্বল মন্ত্রীর সেই ছবি দেখে আমার মনে হয়েছিল বমি করে দিই। গত শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে একবার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেখা করতে হয়েছিল, তিনি আমাদের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করেছিলেন যে, আমি আক্ষরিক অর্থে কান ধরে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আর জীবনে কখনো কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাব না। খবরের কাগজে সেটা লিখেছিলাম বলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমাকেই খবরের কাগজে খুব বকাঝকা করেছিলেন।

এই সরকারের মন্ত্রীরা মনে হচ্ছে আরো এক কাঠি সরেস। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে যে বক্তব্যগুলো রেখেছেন শুধু সেগুলো একত্র করে কেউ যদি একটি বই বের করে আমি বাজি ধরে বলতে পারি, গুরুত্বপূর্ণ মানুষের হৃদয়হীন এবং দায়িত্বহীন বক্তব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন হিসেবে সেটি বেস্ট সেলার হিসেবে বিক্রি হবে। একটা শিশুর মৃত্যুতে যখন পুরো জাতি বেদনাহত তখন তার হৃদয়হীন বক্তব্য এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তার নিজের লোকজনই এখন তাকে রেডিও-টেলিভিশন-সংবাদপত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়ে আছেন। নৌপরিবহন মন্ত্রী সারা পৃথিবীর মাঝে

একমাত্র মন্ত্রী যাকে অন্য একটি দেশের একজন ছোট অফিসার এসে দুর্নীতিপরায়ণ বলে গালাগাল করে তার হাতে দেওয়া টাকাগুলো ফেরত নিয়ে চলে যায়। হৃদয়হীনতায় কেউ কম যান না, মেঘনায় প্রায় অর্ধ সহস্র মানুষের মৃত্যুর পর ঘোষণা দিলেন মৃত পরিবারকে তিনি একটি ছাগল উপহার দেবেন। প্রিয়জনের অভাব ছাগল দিয়ে পূর্ণ করা যায় বলে যে মানুষ বিশ্বাস করে সেই মানুষ এ দেশের মন্ত্রী, একটা দেশের জন্য এর থেকে বড় দুর্ভাগ্য কী হতে পারে?

লঞ্চ দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া মানুষের লাশ যখন শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেয়েছে প্রায় সেই সময়ে নিউইয়র্কে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হচ্ছিল। একদিন আমার মা খুব বিচলিত হয়ে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, 'এতগুলো মানুষের জানাজা হলো না, কবর হলো না, তাদের জন্য কেউ দোয়া করছে না, মিলাদ পড়ছে না। টেলিভিশনে দেখছি সবাই প্রধানমন্ত্রীর হাঁটুর জন্য দোয়া করছে, এটি কী ব্যাপার? দেশের মানুষের কী হয়েছে?' আমি আমার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম, লঞ্চডুবিতে মারা যাওয়া শত শত দুর্ভাগা মানুষের জন্য এ দেশের অসংখ্য মানুষ হৃদয় থেকে দোয়া করেছে, সেগুলো তো টেলিভিশনে আসবে না। টেলিভিশনের ক্যামেরা ডেকে এনে তার সামনে দোয়া করা ভিন্ন ব্যাপার। এটি যতটুকু দোয়া তার চেয়ে বেশি আনুষ্ঠানিকতা। গত প্রধানমন্ত্রীর বেলাতেও আমরা দেখেছি পৃথিবীর নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি জোগাড় করে দেওয়ার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল, এর যেটুকু ছিল আন্তরিকতা তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল চাটুকারিতা।

আমাদের মন্ত্রীরা মনে হয় সব সময় চাটুকারদের দিয়ে ঘিরে থাকেন। চাটুকারিতায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে খুব বিপদ, তখন সাধারণ কথাবার্তা-সমালোচনা সহ্য করা যায় না। তাদের খুব বড় বড় দায়িত্ব রয়েছে, তাদের একটা ভুলে দেশে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে আবার একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে দেশ দাঁড়িয়ে যেতে পারে—কিন্তু মনে হয় তাদের সেটা মনে থাকে না। ধরাকে তাদের সরা মনে হয়—নিজেকে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মনে হয়। মানুষের কোলে বসে জুতোকে কাদামুক্ত রাখেন, গার্মেন্টস ব্যবসায়ীকে দর্জি বলেন, হত্যাকাণ্ডকে অপরাধ মনে হয় না—অর্ধ সহস্র মানুষ ডুবে মরলেও সেখানে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে মনে হয় না। কাজেই বুয়েটের অভিষেক অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পছন্দ হয়নি বলে একটা স্মরণিকা ছুড়ে ফেলতেই পারেন। আমরা একেবারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমলা-পুলিশ অফিসারদের এ রকম জমিদার

সুলভ কাজকর্ম দেখে অভ্যস্ত, মন্ত্রী সে তুলনায় অনেক বড় পদ। তিনি যে নিজের হাতে সম্পাদককে ছুড়ে ফেলেননি সম্ভবত সে জন্যই তাকে মহানুভব বলে ভাবা উচিত।

কিন্তু সবকিছু জেনেও বুকের ভেতর কেমন যেন খচখচ করে। একটা জাতি কতটুকু শিক্ষিত সেটাই হচ্ছে সেই জাতির একমাত্র পরিচয় এবং সেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা মানুষটির কাছে কী আমরা আরেকটু অন্যরকম ব্যবহার আশা করতে পারি না? তিনটি লাইন পড়ে তিনি এত ক্রুদ্ধ হয়েছেন—কেন ক্রুদ্ধ হয়েছেন আমার জানার বড় কৌতূহল। খবরের কাগজের মাধ্যমে দেশের লাখ লাখ মানুষ এখনই সেই তিনটি লাইন পড়ে ফেলেছে—আমি নিশ্চিত তাদেরও সেটি নিয়ে কৌতূহল। শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং তার ব্যাখ্যা দেবেন এরকম কিছু আশা করা এক ধরনের ধৃষ্টতা হয়ে যায়। অন্তত তার মতাদর্শে বিশ্বাস করেন এ রকম কোনো বুদ্ধিজীবী, কোনো কলাম লেখকের কেউ কি আমাকে বুঝিয়ে দেবেন তিনটি লাইনের কোনটি ভুল, কোনটি অসত্য এবং কেন এটি পড়ে সরকারের সবচেয়ে বড় পদে বসে থাকা একজন মানুষ রেগে একটি স্মরণিকা ছুড়ে ফেলে দিতে পারেন?

২.

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণিকার যে তিনটি লাইন পড়ে শিক্ষামন্ত্রী এত ক্ষুব্ধ হয়েছেন তার প্রথম লাইনটি হচ্ছে 'লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মূল্যবোধ আজ ভূলুণ্ঠিত।' বাংলাদেশে যে পৃথিবীর জঘন্যতম গণহত্যা হয়েছিল সেই তথ্যটি পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কাজেই লাখ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে এ দেশের স্বাধীনতা অর্জন হয়েছিল সে কথাটিতে নিশ্চয়ই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর আপত্তি নেই। আমরা খুব ইতিহাস সচেতন জাতি নই, খুব মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিলও অবহেলায় নষ্ট করে ফেলি—তারপরেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে সারাদেশে যে তথ্য ছড়িয়ে আছে সেটা থেকেই সারা পৃথিবীর মাঝে জঘন্যতম গণহত্যার ব্যাপকতাটুকু এখনো অনুমান করা যায়—গণহত্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই প্রায় এক কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, পুরো দেশই পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। কাজেই ধরে নেওয়া যায় তিন লাইনের প্রথম লাইনটি পড়ে শিক্ষামন্ত্রী যদি ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন সেটি হয়েছেন লাইনের দ্বিতীয় অংশটি থেকে, যেখানে বলা হয়েছে স্বাধীনতার মূল্যবোধ আজ ভূলুণ্ঠিত।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে এই দেশে বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়েছিল তখন আমরা সবাই জানতাম এই দেশের মানুষের জন্য একটি নতুন মানবিক এবং আধুনিক আদর্শ এবং মূল্যবোধের জন্ম হয়েছে। পাকিস্তান নামক দেশটি ছিল ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি একটা দেশ, সে দেশে গণতন্ত্র ছিল না, গণতন্ত্র দেওয়া হলে বাঙালির হাতে ক্ষমতা চলে যায় বলে ষড়যন্ত্র শুরু করা হয়, সেই দেশে মিলিটারি দেশ শাসন করে এবং একাত্তরে বোঝা যায় সেই মিলিটারি হচ্ছে পৃথিবীর নৃশংসতম দানব গোষ্ঠী। এই দেশের ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা বা ৩ লাখ মেয়েকে রেপ করতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি। সেই দেশকে পরাজিত করে আমরা যখন বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছি তখন নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্য ছিল না যে এই নতুন দেশটির শুধু নামটি হবে বাংলাদেশ কিন্তু তার কাজকর্ম, উদ্দেশ্য, আদর্শ সবকিছু হবে পাকিস্তানের! কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ঠিক সেই দিকে দেশকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বাধীনতার মূল্যবোধে সব মানুষের, সব ধর্মের সমান অধিকারের কথা বলা ছিল কিন্তু এখন সেটি সত্যি নয়, সংবিধানে শুধু মুসলমান ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম বলা হয়েছে। এই দেশে হাজার হাজার বছর ধরে আছে সেরকম হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা আদিবাসী নানা মানুষের ধর্ম নিজ দেশে তাকে পরবাসী করে রেখেছে।

গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখা হয়েছিল এই দেশে, এখন সেটি ঠাট্টার পর্যায়ে চলে এসেছে। অনেক টাকা খরচ করে নির্বাচন করা এক ধরনের বিনিয়োগ, নির্বাচনের পর বিনিয়োগের টাকাটা সুদে-আসলে তুলে আনা হচ্ছে নির্বাচনে জেতার মূল উদ্দেশ্য। গত সরকারের সময় বিরোধী দল সংসদে যায়নি, এই সরকারের সময়েও বিরোধী দল সংসদে যাচ্ছে না। চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা নির্বাচন করে গুলি খেয়ে মরার জন্য, কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। রাজনীতি করার জন্য ধর্মীয় উন্মাদনা একেবারে পুরোপুরি ব্যবহার করা প্রচলিত রীতি হয়ে গেছে—এবারকার নির্বাচনের আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল নির্বাচনের পর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার—যে জন্য সারা পৃথিবীর সামনে আমাদের মুখ ছোট হয়ে গেছে। একাত্তরে পাকিস্তানের মিলিটারি দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, মেয়েদের রেপ করেছে, কোনো বিচার হয়নি। এখনো এই দেশের মানুষকে পুলিশই হত্যা করে ফেলছে, ধর্ষিতা মেয়ে আত্মহত্যা করে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-লজ্জা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এগুলো বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা নয়—এগুলো এখন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার। আমাদের স্বাধীনতার মূল্যবোধে কি এই কথাগুলো লেখা ছিল? সেই মূল্যবোধ কি আসলেই ভূলুণ্ঠিত হয়নি?

শিক্ষামন্ত্রীর জন্য ক্রুদ্ধ হওয়া খুব সহজ ছিল কিন্তু কেন তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন জাতির সামনে সেই ব্যাখ্যা দেওয়া কী এত সহজ?

সম্পাদকীয়ের দ্বিতীয় লাইনটি ছিল, 'একাত্তরের ঘাতক পাকবাহিনীর দোসর আজ সংগঠিত হয়ে রাষ্ট্রীয় পদসমূহ দখল করেছে।' একাত্তরে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন আমার জানা নেই-কিন্তু তারপরেও ধরে নেওয়া যায় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তিনি জানেন। এ দেশের সাধারণ মানুষ, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, সেনাবাহিনীর সদস্য, বিডিআর, পুলিশ এবং তার রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন তখন জামায়াতে ইসলামী নামক রাজনৈতিক দলটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ হয়ে সেই মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করছিল। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যদি তার মন্ত্রী পরিষদের সভায় চোখ বুলিয়ে তাকান তা হলেই তিনি দেখতে পাবেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিল সেরকম চরিত্র এই মন্ত্রী পরিষদে রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর রাজনৈতিক দল বিএনপি যদি জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে ঐক্যজোট না করত স্বাধীনতাবিরোধীরা কখনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসতে পারত না।

সম্পাদকীয়ের তৃতীয় লাইনটি ছিল, 'আমাদের প্রিয় শিক্ষাঙ্গনে যেন এদের ছায়া না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।'

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য অনেক কিছু সহ্য করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে রাজাকার তার সহযোদ্ধাকে জবাই করেছে, একজন রাজনৈতিক নেতা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তার পাশে বসতে কিছু মনে করেন না—কিন্তু একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র বা ছাত্রী সেটা কল্পনাও করতে পারে না। যারা বাংলাদেশকেও ভালোবাসে, মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ভালোবাসে তারা যদি বাংলাদেশবিরোধী, স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিরোধী ওইসব চরিত্রকে তাদের শিক্ষাঙ্গনে দেখতে না চায় তাহলে সেই আবেগের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানোর অধিকার কারো নেই। বিএনপি সরকার যখন এর আগেরবার ক্ষমতায় ছিল তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন আব্দুর রহমান বিশ্বাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তার বিতর্কিত চরিত্র ছিল বলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান করে তাকে ডাকা হয়নি। সম্পাদকীয়র তৃতীয় লাইনটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ঐতিহ্যের সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ—বিশ্ববিদ্যালয়ের টগবগে তরুণদের কাছে এটাই সবাই আশা করে। আমি নিশ্চিত শিক্ষামন্ত্রী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখন এই ধরনের তীব্র আবেগ এবং আদর্শের জন্য স্বপ্ন নিয়ে বড়

হয়েছিলেন। এখন কেন এর মাঝে তিনি ক্রোধান্বিত হওয়ার বিষয় খুঁজে পাচ্ছেন এবং যদি পেয়েই থাকেন তা হলে সেটা প্রকাশ করে জাতির সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করছেন?

৩.

জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে ঐক্যজোট করার পর অনেকেই যখন স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলানোর অভিযোগ করতে শুরু করল তখন বিএনপির বড় বড় নেতারা বলতে শুরু করলেন অতীতকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, এখন সবাইকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হবে। কথাটি শুনতে বেশ ভালো শোনায় কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবীর সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য আমরা পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত থেকে শুরু করে সাহিত্য, দর্শন এ রকম নানা ধরনের বিষয় গড়ে তুলেছি-এর মাঝে ইতিহাস নামক একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যার কাজই হচ্ছে অতীতকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা! কাজেই অতীতকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হতেই থাকবে। সত্য বের হতেই থাকবে এবং সেগুলো ইতিহাস বইয়ে লেখাও হতে থাকবে। পাঠ্য বইয়ে মিথ্যা লিখে ইতিহাস পাল্টানো যায় না—বরং ইতিহাস বইয়ে লেখা হয়ে যায় যে অমুক মানুষ পাঠ্য বইয়ে মিথ্যা কথা লিখেছিল। ইতিহাস নামক অত্যন্ত নির্দয় একটা বিচারব্যবস্থা থেকে যে কারো কোনো মুক্তি নেই, তার জ্বলজ্যন্ত উদাহরণ হচ্ছে মীর জাফর। সেই আড়াই শ বছর আগে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের পদ লেহন করেছিল—ইংরেজের সাহায্যে সে বড় ক্ষমতাও পেয়েছিল কিন্তু ইতিহাসে সে মীর জাফর হিসেবেই থেকে গেল, যে নামটি আসলে বিশ্বাসঘাতকের সমার্থক। এই দেশে গত আড়াই শ বছরে কোনো বাবা-মা তার সন্তানদের মীর জাফর নাম দেননি, ভবিষ্যতেও দেবে না। যত চেষ্টাই করা হোক মীর জাফর মীর জাফরই থেকে যাবে।

ঠিক সেরকম বাংলাদেশে নতুন মীর জাফর তৈরি হচ্ছে, ভবিষ্যতে যাদের নাম ঘৃণার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। অস্পৃশ্য মানুষের মতো কেউ তাদের স্পর্শ পর্যন্ত সহ্য করবে না। তাদের একজন গোলাম আযমকে বিচার করে জাহানারা ইমাম রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় অভিযুক্ত থেকে মৃত্যুবরণ করেছিলেন কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ জাহানারা ইমামকেই স্নেহভরে স্মরণ করে গোলাম আযমকে নয়। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি, ভাষা সৈনিক হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য বিশাল আয়োজনে দেশের একজন ভাষা সৈনিকও উপস্থিত হননি, ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমার

কাছে কোনো পরিসংখ্যান নেই কিন্তু আমি নিশ্চিত বাংলাদেশের কোনো মা জেনেশুনে তার সন্তানের নাম গোলাম আযম রাখবেন না। একটি দেশে মীর জাফরকে মানুষ যেরকম ঘৃণাভরে স্মরণ করে তাকেও ঠিক একই ধরনের ঘৃণা দিয়ে শত শত বছর স্মরণ করবে জানার পর একজন মানুষ কীভাবে দিন কাটায় আমার জানার খুব কৌতূহল। অন্য যারা একদিন এই দেশের সূর্য সন্তানদের, মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করে এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আছেন তাদের বুকের ভেতরে কি কোনো অপরাধবোধ কাজ করে? তাদের গাড়িতে বাংলাদেশের যে পতাকাটি টানানো থাকে তার ভেতরকাল লাল সূর্যটি যাদের রক্ত দিয়ে লাল রঙে আঁকা আছে তাদেরকে যে তারাই একদিন হত্যা করেছে কখনো কি সেই কথাটি তাদের মনে পড়ে?

৪.

খবরের কাগজে দেখেছি বুয়েটের অভিষেক উপলক্ষে বের করা স্মরণিকার সম্পাদক তাবাসসুম মাহযাবিন মুমুকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। একদিকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তার সমর্থক, তার শাসনযন্ত্র, কর্তৃপক্ষ; অন্যদিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী একাকী এবং নিঃসঙ্গ। আমার হঠাৎ করে ডেভিড এবং গলিয়াথের সেই পৌরাণিক কাহিনীর কথা মনে পড়ে গেল, যেখানে নিরস্ত্র কিশোর ডেভিড অতিকায় দানব গলিয়াথের মুখোমুখি হয়েছিল। একটি দেশের শিক্ষামন্ত্রী অনেক বড় ব্যাপার, কোনোভাবেই তাকে দানবের মতো একটি ছাত্রীর নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে মুখোমুখি কল্পনা করা যায় না। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং সরকারের কাছে অনুরোধ স্বাধীনচেতা একটি ছাত্রীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নিজেদের দানব হিসেবে উপস্থাপন করবেন না। ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করুন।

তাবাসসুম মাহযাবিন মুমু যে তিনটি লাইন লিখেছে এই দেশের লক্ষ কোটি মানুষও কিন্তু সেই তিনটি লাইন বিশ্বাস করে। তাদের সবাইকে কি এই দেশ থেকে অবাঞ্ছিত করে ফেলা যাবে?

দৈনিক প্রথম আলো, ৬/৬/০২

ওয়ার্ল্ড কাপ থেকেও প্রিয়

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন ফুটবল খেলার ব্যাপারটি এত সোজা ছিল না। ফুটবল খেলার আগে বলটাকে রেডি করতে হতো। ফুটবলের চামড়ায় খোলের ভিতরে রবারের একটা "ব্লাডার" ঢুকিয়ে পাম্প করতে হত। পাম্প শেষ করার পর ব্লাডারের গলাটি শক্ত করে বেঁধে ঠেলে খোলের ভিতরে ঢুকিয়ে লেস টেনে বাঁধতে হতো। পুরো ব্যাপারটি ছিল রীতিমতো একটা শিল্পকর্ম—সবাই ঠিক করে করতেও পারত না। আজকালকার ফুটবলে যেমন যেদিকে খুশি লাথি মারা যায়—আগে সেটা এত সহজ ছিল না। ভুল করে লেস বাধা অংশে খালি পায়ে লাথি মেরে আমরা পা ধরে ব্যথায় কঁকাতে কঁকাতে অনেক লাফালাফি করেছি।

বলকে লাথি না মেরে বলের পিছনে পিছনে দৌড়ানোকে যদি বল খেলা বলা যায় তা হলে বলা যেতে পারে শৈশবে আমি নিয়মিত ফুটবল খেলেছি। খেলায় বলকে লাথি মারতে পেরেছি বলে মনে পড়ে না। সারা জীবনেও আমার এই খেলায় কোনো গুণগত উন্নতি হয়নি। শেষ বার ফুটবল খেলেছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে—ছাত্র বনাম শিক্ষক। সেই খেলা শুরু করার আগেই আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম আমার দশ হাতের মাঝে কোনো ছাত্র এলেই সেটাকে ফাউল হিসাবে গণ্য করা হবে, দুই হাতের মাঝে এলে ইয়েলো কার্ড, আমার শরীর স্পর্শ করলেই রেড কার্ড। ছাত্র এবং রেফারি সবাই আমার শর্ত মেনে নিয়েছিল। আমি যেন মাঝে মধ্যে বলকে লাথি মারতে পারি সেজন্য দু'পক্ষই আমাকে নিয়মিত বল পাস দিয়েছে, তার পরেও খুব একটা লাভ হয়নি। সারা খেলাতে একবারও বলকে কষে একটা লাথি মারতে পেরেছি বলে মনে পড়ে না। তবে তাতে আনন্দের কোনো ঘাটতি হয়নি। সেই শৈশবে কাদামাটি বৃষ্টিতে গড়াগড়ি খেয়ে যে আনন্দ হতো, পূর্ণ বয়সেও ঝমঝমে মুশলধারায় বৃষ্টিতে খেলে সেই একই আনন্দ পেয়েছি। খেলায় আসল ব্যাপারটিই তাই—আনন্দ! যে খেলে তার আনন্দ, যে দেখে তার মনে হয় আরও বেশি আনন্দ।

শৈশবে আমরা যখন বান্দরবানে ছিলাম, ফুটবলের সিজনে তখন সেখানে উৎসবের সাড়া পড়ে যেত। পুরো বান্দরবানের সমস্ত মানুষ স্কুল-অফিসার-বাজার এই তিন দলে ভাগ হয়ে ফুটবল খেলত। প্রথমে খেলত স্কুলের ছাত্র, বিভিন্ন

অফিসের অফিসাররা এবং বাজারের ব্যবসায়ীরা। আমার মনে আছে যাদের স্কুলে অতি সাধারণ এমন কী তুচ্ছ এবং নগণ্য একজন ছাত্র হিসাবে দেখে এসেছি খেলার মাঠে তারাই যখন জার্সি পরে নামত তখন তাদের মনে হতো বুঝি ভিন্ন জগত থেকে আসা কোনো রাজপুত্র। আমাদের গোলকিপারের কথা বিশেষ করে মনে আছে, চশমা পরে ফুটবল খেলা যায় না বলে সে চশমা খুলে খেলতে আসত, কিন্তু তাতে সমস্যা, বলকে সে দেখতে পেত না, বলটি কোথায় আছে আন্দাজ অনুমান করে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য একটা বলকে ধরার চেষ্টা করে সে আমাদের বিস্তর আনন্দের খোরাক দিয়েছে। বান্দরবানের সেই খেলা কিছুদিনের মাঝে খুব গুরুতর হয়ে যায় যে স্কুল, অফিসার এবং বাজারের সবাই নিজের দলের জন্য বাইরে থেকে প্লেয়ার "হায়ার" করে আনা শুরু করত। হায়ার করে আনা সেই প্লেয়ারদের খেলা দেখার আগেই তাদের দেখেই আমরা হতবাক হয়ে যেতাম, এই মানুষগুলোকে মনে হতো অলৌকিক কোনো এক স্বপ্নরাজ্য থেকে চলে আসা কিছু মানুষ। অভিনেতা, গায়ক এবং খেলোয়াড় এই তিন ধরনের মানুষ সম্ভবত পৃথিবীতে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ, তাদের কাজ সব ধরনের মানুষকে আনন্দ দেয়া এবং তার প্রতিদানে তারা মানুষের একেবারে ভিতরের খাঁটি ভালোবাসাটুকু ফিরে পায়।

আমি খেলাধুলা বুঝি কম, ফুটবল খেলাটার সাথেই একটু পরিচিতি থাকলেও সেখানেও আমার সমস্যা আছে। যেমন অফসাইড নামক জিনিসটা কী সেটা আমি এখনও বুঝি না। দু-একজনকে জিজ্ঞেস করেছি তারা সাধ্যমতো বোঝানোর চেষ্টা করেছে, কোনো লাভ হয়নি—ব্যাপারটিকে কোনো দলকে হারানোর জন্য রেফারিদের একটা সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র বলে মনে হয়েছে। পৃথিবীতে আমার থেকেও ফুটবল কম বুঝে সেরকম মানুষের সংখ্যাও যে খুব কম নয় আমি সেটা টের পেয়েছিলাম অলিম্পিক খেলা দেখতে গিয়ে। ১৯৮৪ সালে লস এ্যাঞ্জেলেসে অলিম্পিক খেলা হয়েছিল, সারা পৃথিবী থেকে মানুষ লস এ্যাঞ্জেলেসে খেলা দেখতে এসেছে, তাই তার টিকেট পাওয়া ভারি কঠিন।

আমি টিকিটের জন্য এ্যাপ্লিকেশান করে রেখেছি, ভালো কোনো ইভেন্টের টিকিট পাব না সেটি বলাই বাহুল্য, কিন্তু কী আশ্চর্য আমি ফুটবলের একেবারে ফাইনাল খেলার টিকিট পেয়ে গেলাম। আমেরিকার মানুষ ফুটবল খেলা বুঝে না, ফুটবল না বলে সেটাকে বলে সকার, সেই সকার খেলায় কারও কোনো উৎসাহ নেই—তাই আমার এই অভাবিত সৌভাগ্য।

প্যাসাডিনার বিখ্যাত রোজবোল স্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছে, আমরা নির্দিষ্ট সময়ে সেই খেলা দেখতে এসেছি, কৌতূহলের বশে অনেক আমেরিকান এই "বিচিত্র" খেলাটি দেখতে এসেছে—যেখানে বলটাকে হাতে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি

না করে পায়ে লাথি দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে! আমার সামনে বসেছে এক আমেরিকান দম্পতি—খুব মনোযোগ দিয়ে খেলাটি বোঝার চেষ্টা করছে, খেলতে খেলতে এক সময়ে একটা কর্নার কিক দেয়া হলো, প্লেয়াররা তার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ গো—এটা কী হচ্ছে? কী করছে ওরা?" স্বামী বেচারা মাথা চুলকে বললেন, "দাঁড়াও দেখে নিই।" তারপর তিনি পকেট থেকে একটা ঢাউস বই বের করলেন, বইয়ের নাম "সহজ ফুটবল শিক্ষা"! তিনি সেই বইয়ের পাতা উল্টে বললেন, "এটা হয় পেনাল্টি না হয় অফসাইড। কিংবা ফাউলও হতে পারে!"

আমার পক্ষে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। প্যাসাডিনার সেই বিখ্যাত স্টেডিয়ামে একটি ঐতিহাসিক অলিম্পিক খেলা দেখা অবশ্যি আমার জন্য খুব দুরূহ ব্যাপার ছিল। খেলা দেখার থেকে দর্শকদের বেশি উৎসাহ ছিল কোল্ড ড্রিঙ্ক, পপকর্ন বা হট ডগ খাওয়াতে। যতক্ষণ খেলা চলেছে ততক্ষণ দর্শকরা একটু পরে পরে উঠে গেছে সেই খাবার কিনে আনতে, সে এক মহাযন্ত্রণার ব্যাপার। আমেরিকানরা ফুটবলের মতো খেলায় বেশি আনন্দ পায় না কারণ খেলাটিতে গোলের সংখ্যা খুব কম। মিনিটে মিনিটে যদি গোল দেয়ার একটি ব্যাপার হতো তা হলে অনেক বেশি আমেরিকান এই খেলায় আগ্রহী হতো।

সেদেশে মাঠে বসে খেলা দেখে অল্প মানুষ—বেশির ভাগ খেলাই দেখা হয় টেলিভিশনে বিয়ার এবং পিতজা খেতে খেতে। টেলিভিশনে খেলা দেখার প্রথম শর্তই হচ্ছে বিজ্ঞাপন। একটু পরে পরে যদি খেলা থামিয়ে একটা বিজ্ঞাপন দেখানোর ব্যবস্থা করা যেত, আমি নিশ্চিত তা হলে আরও অনেক আগেই এই খেলা আমেরিকায় খুব জনপ্রিয় হয়ে যেতো। আমেরিকার স্কুলে ছোট বাচ্চারা খুব আগ্রহ নিয়ে ফুটবল খেলে, আমার মনে হয় স্কুলে এটা সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। কিন্তু যেই তারা একটু বড় হয়—যারা সত্যিকারের খেলোয়ার তারা এটি আর খেলতে চায় না, সে দেশে এই খেলার কোনো ভবিষ্যত নেই।

ফুটবল খেলায় গোল কম হওয়ায় অভিযোগটি অবশ্যি আমারও। এত কষ্ট করেও একটি গোল হয় না, এমনকি বাড়তি সময় খেলেও গোল হয় না—এটি রীতিমতো একটি হৃদয়বিদায়ক ঘটনা। খেলা দেখার সময় গোল বাড়ানোর জন্য আমি যেসব প্রস্তাব দিয়েছি কিংবা শুনেছি তার কয়েকটা নিশ্চিতভাবে কার্যকর হতে পারে। ফুটবল খেলা নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য ফুটবলপ্রেমিকরা আমার বিরুদ্ধে মামলা করে দিতে পারেন জেনেও প্রস্তাবগুলো এখানে তুলে দিচ্ছি :

(ক) গোলকিপার ছাড়া ফুটবল খেলা! সবাই যখন এত কষ্ট করে সারা মাঠে ছোটোছুটি করে তখন বেচারা গোলকিপার তো অধৈর্য হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে—না হয় একেবারে নাই থাকল। (খ) অফসাইড নামক যে দুর্বোধ্য বিষয়টি আছে

সেটি একেবারে তুলে দেয়া—আমার মনে হয় গোলের সংখ্যা ধাক্কায় অনেক বেড়ে যাবে। (গ) গোলপোস্টটা আরও অনেক লম্বা এবং আরও উঁচু করে দেয়া যেন অতি সহজে কিক করে বল গোলে ঢুকিয়ে দেয়া যায়। সর্বশেষ যে প্রস্তাবটি আমার সবচেয়ে ফেবারিট; সেটি হচ্ছে (ঘ) একটি বল দিয়ে ফুটবল না খেলে একাধিক বল মাঠে ছেড়ে দেয়া (তা হলে মাঠে যা একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হবে সেটা চিন্তা করেই আমি আনন্দে হাসি থামিয়ে রাখতে পারি না!)

ওয়ার্ল্ডকাপ খেলা শেষের দিকে চলে এসেছে। খবর পেয়েছি যে কোরিয়া শেষ পর্যন্ত জার্মানির কাছে হেরে গেছে। আমি খেলাটি দেখিনি কিন্তু তারপরেও লাখ লাখ আশাহত কোরিয়ানের বেদনাটি আমি ঠিকই বুঝতে পারি। তারা খেলাটিকে নিশ্চয়ই খুব গুরুত্ব দিয়ে নেয়, কারণ খবরের কাগজে দেখেছি একজন কোরিয়ান যুবক শরীরে আগুন দিয়ে মারা গেছে যেন তার বিদেহি আত্মা বারো নম্বর প্লেয়ার হিসাবে কোরিয়ান খেলোয়ারদের সাহায্য করতে পারে। সেমিফাইনাল খেলায় তারা হেরে যাওয়াতে অন্তত একটি জিনিস প্রমাণিত হলো—বারো নম্বর বিদেহী খেলোয়ার হয়েও "দেহী" খেলোয়ারদের সাথে পাল্লা দেয়া যায় না। আশা করি, ভবিষ্যতে অন্তত এই কারণের জন্য আর কেউ আত্মাহুতি দেবে না।

ওয়ার্ল্ডকাপ খেলা এখন একেবারে শেষ পর্যায়ে কোটি কোটি মানুষ টেলিভিশনে এই খেলা দেখেছে। টেলিভিশন খেলার মাঝে সম্পূর্ণ নতুন একটি জিনিস নিয়ে এসেছে। বড় মাঠে যখন কেউ খেলা দেখে তখন দূর থেকে খেলোয়াড়দের মুখের অভিব্যক্তি খুঁটিনাটি দেখা যায় না, ক্যামেরার লেন্স হঠাৎ করে সেই বাধা অতিক্রম করেছে। আমরা টেলিভিশনে শুধু যে তাদের অনুপম খেলার ভঙ্গি দেখতে পাই তাই নয়—একই সাথে তাদের মুখের ভঙ্গি, একাগ্রতা, আশা, হতাশা, দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, ভালোবাসা, উল্লাস-অবিশ্বাস সবকিছু দেখতে পাই। আমি যতবার খেলা দেখেছি খেলোয়াড়দের সেই অবিশ্বাস্য ক্রীড়া নৈপুণ্যের সাথে সাথে তাদের মুখের ভাবভঙ্গি অনেক বেশি আগ্রহ নিয়ে দেখেছি। শুধু যে খেলোয়াড়দের মুখের অভিব্যক্তি তা নয় দর্শক এবং কোচদের অভিব্যক্তি দেখাও একটা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। আমি ব্যক্তিগতভাবে খেলা না দেখে, খেলা চলাকালীন সময়ে শুধুমাত্র তাদের মুখের ভাবভঙ্গি দেখার জন্য টেলিভিশনের সামনে বসে থাকতে পারব। খেলা না বুঝেও আমি যে এই ওয়ার্ল্ডকাপে এক দুইজন খেলোয়াড়কে ভালোবেসে ফেলিনি তা নয়। ব্রাজিলের লম্বা চুলের তরুণ—যার নাম যতদূর সম্ভব রোনাল্ডিনহো, সবসময় হাসছে। এই মানুষটির শিশুর মতো নিষ্পাপ হাসি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কোনো একটি খেলায় লাল কার্ড দিয়ে তাঁকে মাঠ থেকে বের করে দিচ্ছে সেই সময়েও তাঁর মুখে অপ্রস্তুত একধরনের

হাসি—এ রকম মানবিক একটি দৃশ্য আমি খুব কম দেখেছি। খেলা নয়—খেলার সাথে সংশ্লিষ্ট আবেগটুকুই আমাকে অনেক বেশি স্পর্শ করে। আমার জন্য সেটাই অনেক বেশি নিরাপদ। কেননা খেলার বিজয়ের আনন্দ আমি পেয়েছি খুব কম। নির্দিষ্ট কোনো দল ফেবারিট না হওয়ায় যে দলটিকে একটু দুর্বল মনে হয় যারা হারতে থাকে তাদের জন্যই মায়া হয় বেশি—মনে মনে সেই দলকে সাপোর্ট করে বসে থাকি আর তার ফলে প্রায় অবধারিতভাবে আমার টিম শেষ পর্যন্ত হেরে বসে থাকে। ওয়ার্ল্ডকাপ খেলায় আমি হচ্ছি একেবারে পাকাপাকিভাবে হেরে যাওয়া দলের মানুষ—খেলা দেখে নিয়মিতভাবে দুঃখ পাবার মানুষ।

কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে এই ওয়ার্ল্ডকাপ খেলা থেকে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি কি? আমি বলব একটি তথ্য—সেটি হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং মাননীয় বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা দু'জনেই ব্রাজিলের সমর্থক। বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'জন মানুষ নাকি একজন আরেকজনের সাথে কথা বলেন না। ছোট বাচ্চারা অনেক সময় একজন আরেকজনের সাথে কথা বলে না, আড়ি দিয়ে মুখ ভার করে বসে থাকে। তারা কিন্তু ভিতরে ভিতরে কথা বলার জন্য উসখুস করতে থাকে, জোর করে তাদের ধরে এনে ভাব করিয়ে দেয়া হলে মুহূর্তে তাদের সব অভিমান ভেঙ্গে যায় এবং তাদের মুখে খই ফুটতে থাকে। সেই হিসাবে আমাদের মনে হয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেত্রী বুঝি শিশুদের থেকেও ছেলেমানুষ। তারা দু'জনই ব্রাজিলকে পছন্দ করে শুনে আমার খুব ভাবতে ইচ্ছা করে তাঁরা দু'জন পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে ফাইনাল ওয়ার্ল্ডকাপ খেলা দেখবেন। তাঁদের টিম ব্রাজিল জিতে গেলে একজন আরেকজনকে বলবেন, "দেখেছেন আমি আগেই বলেছিলাম না, ব্রাজিল জিতে যাবে!" অন্যজন বলবেন, "হ্যাঁ, রোনাল্ডিনহো কী সুন্দর খেলেছে দেখেছেন!"

কিংবা ব্রাজিল যদি খেলায় হেরে যায়, তখন হয়ত একজন বলবেন, "এই ব্যাটা রেফারির জন্য হেরে গেছে।" অন্যজন বলবেন, "ঠিক বলেছেন, মিথ্যামিথ্যি কেমন পেনাল্টি দি য়েছে দেখেছেন?" তখন দু'জনে নিশ্বাস ফেলে বলবেন, "আমাদের বাংলাদেশ যখন ওয়ার্ল্ডকাপ যাবে—তখন কী মজাটাই না হবে!"

একেবারে সাধারণ কথা—আমরা খেলা দেখতে গিয়ে যে সাধারণ কথা বলি। আমি লিখে দিতে পারি সারা বাংলাদেশের মানুষ ওয়ার্ল্ডকাপ খেলা দেখে যে আনন্দ পেয়েছে তার থেকে একশ'গুণ বেশি আনন্দ পাবে যদি তাঁরা এই দৃশ্যটি দেখত। বাংলাদেশের দু'জন নেত্রী পাশাপাশি বসে ওয়ার্ল্ডকাপ খেলা দেখছেন!

এটি কী এতই অসম্ভব একটি ব্যাপার?

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ জুন ২০০২

ছাত্ররাজনীতির পুরনো কাসুন্দী

১.

গত সরকারের আমলে হরতালের সময় মানুষ পুড়িয়ে মারার একটা রেওয়াজ ছিল। প্রথমবার যে রিকশাওয়ালাকে পুড়িয়ে মারা হলো তার নাম ছিল মোহম্মদ আলী—খবরের কাগজে নামটি ছাপা হয়েছিল বলে মনে আছে। এরপর সাংবাদিকরা উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন, যাদের পুড়িয়ে মারা হতো তাদের নামধাম ছাপা হতো না। ছোট করে খবরটা ছাপা হতো। পুলিশের হাতে মারা যাওয়ার ব্যাপারগুলোও এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। গত সরকারের আমলে সংগঠিত রুবেল হত্যার বিচারের রায় বের হতে চার বছর সময় লেগেছে—তবুও তো তার বিচার হয়েছে। সদ্য মারা যাওয়া জামাল হত্যার বিচার হবে কি না কে জানে। পিটিয়ে মারার ব্যাপারে বিডিআরও হাত লাগিয়েছে। যাদেরকে মারা হচ্ছে তাদের সামাজিক অবস্থা হয়তো ভালো নয় তাই খবরগুলো আর সংবাদপত্রে গুরুত্ব পাচ্ছে না। ধর্ষিত মহিমা আত্মহত্যা করেছিল বলে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় খবরটি এসেছিল, দেশের মানুষ কিছুদিন তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে শান্ত হয়েছে—তবে মহিমার পদ্ধতিটি দেশের দুর্ভাগা মেয়েদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি বলে মনে হয়েছে। আজকাল ধর্ষিত মেয়েরা খুব সহজেই আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা-যন্ত্রণা চুকিয়ে দিচ্ছে, খবরগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, খবরের কাগজের ভেতরের পাতায় ছোট করে ছাপা হয়। সাধারণ খুন আজকাল খবর নয়—আমাদের বিচলিত হওয়ার জন্য নওশীনের মতো অবুঝ কোনো শিশুকে তার বাবার কোলে খুন হতে হয়। সেই বেদনাদায়ক ঘটনাটির কথা ভুলে যাওয়ার অগেই বুয়েটের ছাত্রী সনি সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রাণ হারাল। সারা দেশের মানুষ হতবাক হয়ে ঘটনাটির কথা শুনেছে। আর কয়দিন পর যখন আরো ছাত্রছাত্রী রুটিনমাফিক গুলিতে প্রাণ হারাবে তখন কী আমরা এতেও অভ্যস্ত হয়ে যাব? আমরা কী ধীরে ধীরে নিজেদের বোধশক্তিহীন, অনুভূতিহীন, বর্বর অসভ্য এবং জংলি একটি জাতিতে পাল্টে ফেলছি?

সনি বুয়েটের ছাত্রী ছিল, তার এই বেদনাদায়ক মৃত্যুতে সহপাঠীদের প্রচণ্ড ক্ষোভের কারণে ব্যাপারটি এখনো স্তিমিত হয়নি। খবরের কাগজে টগর এবং

মুকি নামের কিছু সন্ত্রাসী ছাত্রের নাম এসেছে, তাদের হর্তাকর্তা হিসেবে নসিরুদ্দীন পিন্টুর নাম ছাপা হয়েছে। সন্ত্রাসী হিসেবে এই মানুষটি গ্রেপ্তার হয়ে আবার বহালতবিয়তে ফিরে এসেছেন—মানুষটি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার খুব বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। 'ছাত্রনেতা হতে হলে ছাত্র হতে হয় কে বলেছে?' এই বিখ্যাত উক্তি করে তাকে ছাত্র সংগঠনের মূল দায়িত্বটি দেওয়া হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বুয়েটের চ্যান্সেলর। বুয়েটের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর সবচেয়ে বড় অভিভাবক। তার কাছে কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ—বুয়েটের ছাত্রছাত্রীরা নাকি টগর, মুকি, নাসিরুদ্দীন পিন্টু কিংবা তার রাজনৈতিক দলের অন্যান্য কিছু দুর্বৃত্ত? লোভ-লালসা নৈরাজ্য আর সন্ত্রাসের যে বিশাল বিষবৃক্ষ তৈরি হয়েছে তিনি কি তার ছোট দু-একটা ডাল ভেঙে দিবেন নাকি তার শিকড় কেটে দেবেন সেটা দেখার জন্য পুরো জাতি খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

খবরের কাগজে দেখেছি সনির মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী তার অফিসে সনির শোকবিহ্বল পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। সনির বাবা-মায়ের প্রতি আমি শ্রদ্ধাবনত হয়েছি, তারা সকল শোককে বুকের মাঝে পাথর-চাপা দিয়ে বুয়েটের মতো শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য বলেছেন। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে এবং হঠাৎ করে আবার ছাত্ররাজনীতির বিষয়টি নতুন করে চলে এসেছে। ছাত্ররাজনীতি ভালো না খারাপ, এটা থাকা উচিত না অনুচিত এই বিষয়গুলো নিয়ে আবার নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

যারা মনে করেন বিষয়টি খুব সহজ এবং সরল, কোনো এক জায়গায় 'ছাত্ররাজনীতি' নামে একটা সুইচ আছে সেটা অফ করে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে ছাত্ররাজনীতির নামে সন্ত্রাস, খুন, চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, নির্যাতন, ধর্ষণ সবকিছু বন্ধ হয়ে যাবে—তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যায় সেটি সত্যি নয়। যারা মনে করেন ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে ঠিক কীভাবে সেটি বন্ধ করা হবে—এবং বন্ধ করা হলে কেন সেটি বন্ধ থাকবে। আর যারা মনে করেন ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত নয় তাদেরও বুঝিয়ে দিতে হবে সেটি আমাদের ছাত্রদের, সমাজের বা দেশের কী কাজে আসছে এবং কীভাবে এটি আমাদের দেশের জন্য একটি ইতিবাচক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

২.

কিছুদিন আগে পাকিস্তানের একজন প্রফেসর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি কীভাবে খোঁজ পেয়েছেন যে আমি পাকিস্তান সম্পর্কে

লেখালেখি করি। আমি সবিনয় তাকে জানালাম যে সেটি সত্যি নয়, মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংতা কিংবা আমাদের দেশের মৌলবাদীদের পাকিস্তানপ্রীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বিচ্ছিন্ন যা লেখালেখি করেছি সেটি পাকিস্তানের একজন শিক্ষাবিদের হাতে দেওয়ার মতো কিছু নয়। পাকিস্তানের সেই প্রফেসরের সঙ্গে তাদের দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা, মৌলবাদের উত্থান এ ধরনের গুরুতর বিষয় নিয়ে অনেক কথা বলেছি। এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি নেই, সেটি নিয়ে পড়াশোনার ক্ষতি হয় না?' ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, 'ছিল, এক সময়ে ভয়ঙ্কর খারাপ অবস্থা ছিল। অস্ত্র নিয়ে গোলাগুলি, খুনোখুনি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, ধর্ষণ—এমন কোনো কাজ ছিল না যেটা হতো না। এখন ভালো, নিয়মিত পড়াশোনা হয়, কোনো সেশন জ্যাম নেই।' আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, 'কীভাবে এই অসাধ্য সাধন করেছো?' ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, 'খুব সহজ। ক্যাম্পাসের ভেতরে সব সময় ৩০০ সশস্ত্র প্যারা-মিলিশিয়া থাকে। হল থেকে সব ছাত্রকে বের করে সেগুলোতে নতুন ডিপার্টমেন্ট, ক্লাসরুম তৈরি করা হয়েছে। ছাত্ররা কোথায় থাকবে, কী করবে এটা তাদের মাথাব্যথা—ক্যাম্পাসের ভেতরে কোনো হ্যাংকিপ্যাংকি নেই। ইউনিভার্সিটির কোনো ছাত্র হল নেই, কোনো হল দখলও নেই, কোনো সন্ত্রাসও নেই। ছাত্ররা একটু গোলমাল করলেই মিলিশিয়া ঠ্যাঙ্গানি দিয়ে তার বারটা বাজিয়ে ছেড়ে দেয়!' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ছাত্ররা এতে খুশি?' ভদ্রলোক বললেন, 'নিয়মিত পড়াশোনা করতে পারছে—খুশি হবে না কেন?'

ছাত্ররাজনীতির সমস্যা সমাধানের এই পাকিস্তানি স্টাইলের কথা শুনে আমি হা হয়ে বসে রইলাম। আমাদের প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পুলিশ থাকে—আস্তে আস্তে আমরাও কি পাকিস্তানি সমাধানের দিকে এগিয়ে যাব? বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে পড়াশোনার সবচেয়ে উঁচু ক্ষেত্র, সেখানে যদি ছাত্রছাত্রীদের পুলিশ-মিলিশিয়া-মিলিটারি দিয়ে ঠ্যাঙ্গানি দিয়ে পড়তে বাধ্য করতে হয় তাহলে সেই বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে আমরা কী করব? একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় হচ্ছে এই সময়টুকু, এখন যদি সে তার পাশে কোনো সুন্দর, মহৎ এবং আদর্শের ছবি না দেখে ঠ্যাঙ্গানি খাওয়ার ভয়ে পড়াশোনা করে সে কেমন করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখবে?

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা যায় যে, আমাদের দেশেও ধীরে ধীরে এই পাকিস্তানি স্টাইল শুরু হয়ে যাচ্ছে—মাঝে মাঝেই খবরের কাগজে দেখি অমুক শহরে রাতের বেলা কোনো তরুণ ঘর থেকে বের হতে পারবে না। স্বাধীন একটা

দেশের একজন তরুণের অধিকারের ওপর এত বড় একটা হস্তক্ষেপ—কিন্তু দেশের কেউ তার বিরুদ্ধে একটি কথা বলছে না দেখে আমি খুব অবাক হয়ে যাই। যারা অপরাধ করে, সন্ত্রাস করে তাদের ধরে শাস্তি দিতে হবে, কেন হাজার হাজার, লাখ লাখ নিরপরাধ সাধারণ তরুণদের ওপরে এই পীড়ন? জুতো আবিষ্কারের আগে পায়ে ধুলো লাগবে বলে হবুচন্দ্র রাজা সারাদেশ চামড়া দিয়ে ঢেকে দিতে গিয়েছিল—আসলে শুধু পা দুটো ঢাকলেই হয়। ঠিক সেরকম দেশের সকল তরুণকে ঘরের ভেতর আটকে রাখতে হয় না, যারা অপরাধী শুধু তাদেরকেই জেলখানায় আটকে রাখতে হয়। সেটি যদি করতে না পারে তা হলে সেটি অক্ষমতা, তার জন্য কর্তৃপক্ষের ধিক্কার পেতে হবে, সাধারণ নিরপরাধ তরুণদের ওপর কারফিউ দিয়ে ঘরের ভেতরে আটকে রেখে বাহবা নিতে পারবে না। মনে হচ্ছে আমরা বুঝি আস্তে আস্তে হবুচন্দ্রের দেশ হয়ে যাচ্ছি, কোনো কাজটি প্রশংসার, কোনটি নির্বুদ্ধিতার সেটিও বুঝতে পারছি না।

৩.

ট্রেনে করে যাচ্ছি, আমার পাশে বসেছে একজন তরুণ, কথা বলে জানতে পারলাম সে একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তার খুব মন খারাপ, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে (সৌজন্যের কারণে এই স্বনামধন্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটি উল্লেখ করলাম না) গিয়ে জানতে পেরেছে যে সেখানে ফি আবার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনোরকম আলাপ-আলোচনা নেই, পূর্বপ্রস্তুতি নেই—একেবারে হঠাৎ করে একটা নোটিশ। তরুণটি বিষণ্ন মুখে বলল, 'স্যার, সব সময় আমি ছাত্ররাজনীতির বিরুদ্ধে ছিলাম—এই প্রথমবার মনে হলো আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যদি ছাত্রদের সংগঠন থাকত তা হলে কী তারা এর প্রতিবাদ করত না? এত সহজে কী কর্তৃপক্ষ যখন খুশি ফি বাড়িয়ে দিতে পারত?'

আমাদের দেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন সম্ভবত ত্রিশের কাছাকাছি, মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কম নয়। এই বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের সবাই যে বড়লোকের সন্তান, ফি বাড়িয়ে দিলে কিছু আসে যায় না, তা নয়। আজকাল অনেক মধ্যবিত্তের সন্তান ঠিক সময়ে পাস করে বের হবে, গুলি খেয়ে মারা যাবে না, পছন্দের বিষয়টি পড়তে পারবে, এই ধরনের কারণে অনেক কষ্ট করে হলেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। এ রকম ছাত্রছাত্রীদের যে প্রতিবাদের অধিকার নেই আমার জানা ছিল না। একজন ছাত্র নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্বের

প্রয়োজন কিছুক্ষণের জন্য হলেও কামনা করেছিল সেটি আমার জন্য একটি বড় সংবাদ ছিল। আলাদাভাবে একজন ছাত্রকে কর্তৃপক্ষ কলমের এক খোঁচায় ধ্বংস করে দিতে পারে, সংগঠিত গোষ্ঠীকে পারে না। ছাত্ররাজনীতি না করে ছাত্ররা কি প্রয়োজনে সংগঠিত হতে পারে? নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারে?

৪.

ছাত্ররাজনীতি নিয়ে আমি যেসব ব্যাপার ঘটতে দেখেছি তার মাঝে যেটি আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল সেটি ঘটেছিল সিলেটে। সেখানকার সব বড় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মনে হলো ছাত্ররাজনীতির কারণে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ঠিক করে হচ্ছে না তাই কিছুদিন ছাত্ররাজনীতি বন্ধ থাকুক। তারা সাময়িকভাবে সিলেট শহরে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ রাখলেন এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্য সেই কয়েক মাস সিলেট শহরে কোনো গোলমাল হয়নি। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা হয়েছে। পত্রপত্রিকায় সেই খবর ছাপা হয়েছে এবং সবাই 'সাধু সাধু' বলে এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছে।

এই ঘটনাটি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে খুব বিচলিত করেছিল কারণ আমার জানামতে এই ঘটনাটি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া হলো আমাদের দেশের ছাত্র সংগঠনগুলোর নিয়ন্ত্রণ করে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো। ছাত্রদের আনুগত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে নয়। তাদের আনুগত্য শহরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে। তাদের নির্দেশে তারা পড়াশোনা করবে আবার ঠিক তাদের নির্দেশে একটা প্রতিষ্ঠানে গোলযোগ সৃষ্টি করে পুরো কাজকর্ম অচল করে দেবে। এই দেশে যারা ছাত্ররাজনীতি করে তাদের যারা ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হিসেবে ভাবতে পছন্দ করেন তাদের জানা দরকার—এই ছাত্রনেতারাও মূল রাজনৈতিক নেতাদের সামনে মেরুদণ্ডহীন চরিত্র কিংবা বোধ শক্তিহীন রোবট ছাড়া আর কিছু নয়।

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে—তার মাঝে আমার নাম উল্লেখ করে আমার বিরুদ্ধে কিছু গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। নামহীন উড়ো চিঠিতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি—(এ ব্যাপারে মৌলবাদীদের কোনো তুলনা নেই, তারা একবার লিফলেট বিতরণ করেছিল আমার নিজের নামে, যেন আমি সেটা ছাপিয়ে বিতরণ করেছি! বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য সেখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কিছু কথা বলে মাঝখানে ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত অসম্মানজনক কিছু কথা লিখা ছিল, উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় উন্মাদনা

দিয়ে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা।) বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতরণ করা এই লিফলেটটি একটু অন্যরকম, কারণ তার নিচে কিছু ছাত্রের নাম লেখা আছে—এটি উড়ো চিঠি নয়, কিছু ছাত্র সজ্ঞানে তার দায়িত্ব নিয়েছে। আমি সেই ছাত্রদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম, তারা দেখা করতে এলে আমি বলেছিলাম, 'তোমরা কাগজে লিখে এটি বিতরণ করেছো। আমার শুধু একটি অনুরোধ, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে বলবে এই অভিযোগগুলো সত্যি।' ছাত্ররা মাথা নিচু করে বলেছিল, তারা জানে এগুলো সত্যি নয় কিন্তু উপরের নির্দেশে তাদের এগুলো করতে হয়—তাদের এর বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা নেই।

ছাত্ররাজনীতির অভিশাপ অভিশপ্ত এই ছাত্রগুলোকে আমরা শুধু দোষারোপ করেছি, কারা তাদের এই অব্যবস্থায় নিয়ে এসেছে কখনো কি সেটা চিন্তা করে দেখেছি? মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ছাত্রদের প্রতি আমি কোনো ক্রোধ অনুভব করিনি—একটি গভীর করুণা অনুভব করেছিলাম। আমরা উশৃঙ্খল ছাত্রদের শুধু শাস্তি দেওয়ার কথা বলি কিন্তু শাস্তি দেওয়ার পর্যায়ে আমরাই যদি তাদের ঠেলে দিয়ে থাকি তাহলে সেই দায়ভার কি আমরা নেব না?

অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার ব্যাপারটি থেকে যে জিনিসটি সবার সামনে স্পষ্ট করা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমরা সেটা অনেকদিন থেকে জানি। এখন দেশ চালানোর অর্থ হচ্ছে সবকিছু নিজের দলের মানুষ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা—দেশের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে একেবারে অফিসের পিয়নটিকেও নিজের দলের মানুষ হতে হবে। ব্যাপারটি বিশেষ দুঃখের হয় যখন দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপাচার্যকে পাল্টে দেওয়া হয়, সেই উপাচার্য তার দলের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচালনা করেন এবং সেখানে ছাত্রদেরও ব্যবহার করা হয়। একজন উপাচার্যকে নিয়োগ দেওয়া হলে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সংসদ নির্বাচনে ছাত্র সংসদকে জিতিয়ে আনা। হঠাৎ করে কেউ যদি উপাচার্যের ঘরে হাজির হয় সেখানে সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত ছাত্রনেতাদের দেখতে পাওয়া এমন কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয়। পুরো প্রতিষ্ঠানটি আসলে একটি রাজনৈতিক দলের মতো কাজ করে যেখানে উপাচার্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ছাত্ররা হচ্ছে সেই রাজনৈতিক দলের কর্মী। দলীয় কর্মীদের জন্য সমবেদনা থাকে তাই ছাত্ররা কোনো অন্যায় করলে তার দলের শিক্ষকরা তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। (জাহাঙ্গীরনগরের সেঞ্চুরিয়ান ধর্ষক হচ্ছে এর একটি ক্লাসিক উদাহরণ)।

কাজেই আমরা হঠাৎ করে যদি ছাত্ররাজনীতির ওপর খড়গহস্ত হই তাহলে শিক্ষক রাজনীতির উপরেও খড়গহস্ত হতে হবে। কেউ যদি মনে করেন শিক্ষকরা চুটিয়ে রাজনীতি করে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকবেন এবং আইন করে ছাত্রদের রাজনীতি বন্ধ করে দেবেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি দেশের প্রকৃত অবস্থাটা জানেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির অসুস্থ ধারাটি আসলে শিক্ষক রাজনীতির হাত ধরে গড়ে উঠেছে, একটিকে লালন করে অন্যটির মূলোৎপাটন করা যাবে না। কেউ যদি দেশের বর্তমান ধারার অসুস্থ ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে চায় তাকে শিক্ষকের রাজনীতিও বন্ধ করতে হবে।

৫.

আইন করে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার কথাটি প্রায়ই শোনা যায়। আমাদের দেশে তো খুন, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে আইন আছে কিন্তু তার কিছুই তো বন্ধ হয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে একটা আইন করা হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হয়ে যাবে সেটা কে বলেছে? সব বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রক্টরিয়াল আইন আছে, সেখানে স্পষ্ট করে বলা আছে ধর্মঘট করে পড়াশোনা বন্ধ করা যাবে না—সেই আইন কে কবে মেনেছে? তাহলে প্রতিষ্ঠানিকভাবে আইন ভঙ্গ করতে দেওয়ার জন্য আরেকটা আইন তৈরি করে সবাইকে নতুন করে লজ্জা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে কী হবে? আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা নিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে সময়কার বিরোধী দলের নেত্রী খালেদা জিয়া রাজি হননি। এখনকার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ছাত্ররাজনীতির বন্ধের প্রস্তাব দিচ্ছেন—বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা এখন রাজি হচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটুকু সবার কাছে এতো স্পষ্ট তারপরও আমরা সবাই পত্র-পত্রিকায় এগুলো নিয়ে লেখালেখি করি, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কৌতুকের ব্যাপার।

একটা সমস্যা সমাধান করার আগে সমস্যাটি বুঝতে হয়—ছাত্ররাজনীতির বেলায় আমরা যেন সমস্যাটি বুঝতেই চাইছি না। আসলেই কী আমরা সমস্যাটির সমাধান করতে চাই? আমার কেন জানি বিশ্বাস হয় না।

দৈনিক প্রথম আলো, ৯/৭/০২

যেভাবে লেখা হলো : দীপু নাম্বার টু

পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি করার জন্য দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি—বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্রের একেবারে উত্তর-পশ্চিম কোনায় একটি শহর। দেশ ছেড়ে আসার যে কী কষ্ট আমি সেটা প্রথমবার বুঝতে শুরু করেছি, দেশ ধরা-ছোঁয়ার বাইরের বিমূর্ত কোনো জিনিস নয়—একেবারে যেন রক্তে-মাংসে গড়া সত্যিকারের কিছু। সিয়াটল শহরের পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, তার অপর পাশে নিজের দেশ—ইচ্ছা করে সেদিকে তাকিয়ে হাউমাউ করে কাঁদি। আজকালের মতো ই-মেইল নেই, টেলিফোন নেই, থাকলেও টেলিফোন করার মতো পয়সা নেই, যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে চিঠি। সেটা যেতে পনের দিন। তার উত্তর আসতে আসতে আরো পনের দিন। আমার মা প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি দেন। আমি বুভুক্ষের মতো সেই চিঠির জন্য বসে থাকি। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবেরা চিঠি দেয়, তাদের এক পৃষ্ঠার চিঠি পেলে আমি সাত পৃষ্ঠার চিঠি লিখি, সেই চিঠি পেয়ে তাদের চোখ ছলো ছলো হয়ে যায় তারা তখন চৌদ্দ পৃষ্ঠার একটা চিঠি লিখে বসে থাকে।

ক্লাস শুরু হওয়ার পর কষ্ট আরো দশগুণ বেড়ে গেছে। পড়াশোনার ব্যাপারটি আজীবন হালকাভাবে নিয়ে এসেছি। কখনো কোনো চাপ অনুভব করিনি—এখানে তার কোনো উপায় নেই, কোর্স টিচাররা রাক্ষুসে সব হোমওয়ার্ক দিয়ে বসে থাকেন, দু'দিন পরে পরে পরীক্ষা—এমনিতে টিচিং অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে সিনিয়র প্রফেসরদের খাতা দেখতে হয়, টিউটরিয়াল ক্লাস নিতে হয়। সব মিলিয়ে একেবারে গলদঘর্ম অবস্থা।

সবকিছুই কোনো-না-কোনো ভাবে সহ্য করা যায়, কিন্তু একটি ব্যাপার ধীরে ধীরে একেবারে অসহনীয় হয়ে গেল—সেটি হচ্ছে বাংলায় কথা বলতে না পারা। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনে তখন প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার ছাত্রছাত্রী—সারা পৃথিবী থেকেই ছাত্রছাত্রীরা পড়তে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্র আমি একা। দিনের পর দিন চলে যায় কিন্তু বাংলায় আমি একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারি না। সেটা যে কী ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার যারা এর ভেতর দিয়ে না গেছে তারা সেটা বুঝতে পারবে না। অনেক সময় আমি আবিষ্কার করেছি বিড় বিড় করে

একা একা বাংলায় কথা বলছি—বাংলা শুনতে কেমন লাগে সেটা দেখার জন্য। সিয়াটল শহর কিছুদিনের মধ্যে আরো মন খারাপ করা হয়ে গেল। শহরটি অনেক উত্তরে কাজেই যতই শীতকালের কাছাকাছি যেতে লাগল ততই দিনগুলো ছোট হতে লাগল। শেষে এমন একটা অবস্থা যে, সকাল নয়টাতেও সূর্য উঠতে চায় না আবার বিকেল তিনটার দিকে সূর্য ডুবে যায়। যতক্ষণ সূর্য আকাশে থাকে ততক্ষণও তাকে দেখা যায় না। আকাশ সারাক্ষণ মেঘে ঢাকা এবং চব্বিশ ঘণ্টা তার মাঝে ভিজে কুয়াশার মতো এক ধরনের বৃষ্টি। সে যে কী মন খারাপ করা পরিবেশ কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। তার মাঝে আমি পুরোপুরি নিঃসঙ্গ একজন মানুষ একা একা ঘুরে বেড়াই।

এরকম অবস্থায় মানুষ মনে হয় পাগল-টাগল হয়ে যায়, আমি হলাম না। কারণ ঠিক এরকম সময় দীপু নামে তেরো-চৌদ্দ বছরের একটা কিশোরের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। মা নেই, বাবার সঙ্গে থাকে, দেশের নানা অঞ্চল ঘুরে বেড়ায়। তার কয়দিন পর তার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় হলো, একজনের নাম তারেক—মহাপাজি ছেলে তবু তার ওপর আমার কেমন যেন মায়া পড়ে গেল। দীপুর মার সঙ্গেও পরিচয় হলো। তার ছেলে থেকেও নেই—আমি কেমন এক ধরনের সমবেদনা অনুভব করতে থাকি। এরা সবাই কাল্পনিক চরিত্র কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা নেই, আমার কাছে তারা একেবারে সত্যিকারের মানুষ। পড়াশোনার ভয়ঙ্কর চাপের মাঝে আমি তাদের চরিত্রদের নিয়ে খেলা করি। তারা কে কী বলছে কে কী করছে গভীর আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করি। ধীরে ধীরে কিশোর একটা ছেলের, তার বন্ধুদের, খাপছাড়া বাবা এবং দুঃখী মায়ের একটা কাহিনী একেবারে পুরোপুরি আমার মাথার মধ্যে দানা বেঁধে উঠল। এখন বাকি কাজটা লিখে ফেলা—কিন্তু সেটাই হলো মুশকিল। ডর্মিটরিতে আমি যে রুমে থাকি সেখানে আমার একজন রুমমেট আছে, সে যদি আমার উপন্যাস লেখা দেখে হাসাহাসি শুরু করে?

লেখার জন্য হাত নিশপিশ করছিল তাই শেষ পর্যন্ত লেখা শুরু করলাম। রুমমেট বাংলা পড়তে পারে না, আমার লেখা দেখে জিজ্ঞাসা করল—'কী লেখ?' আমি উদাস উদাস মুখ করে বললাম, 'চিঠি'। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আমি কাগজের ওপরে বাম দিকে লিখে রেখেছি 'প্রিয় অমুক' ডান দিকে তারিখ—তারিখের নিচে ঠিকানা। সে অবাক হয়ে আমার চিঠি লেখা দেখে তারপর অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। আমার তখনো কোনো বন্ধুবান্ধব হয়নি—রুমমেটের অনেক বন্ধু আসে, সে আমাকে দেখিয়ে তাদের বলে, 'এই দেখো এর কারবার। কাজ নেই কর্ম নেই দিনরাত বসে বসে শুধু চিঠি লিখে, লম্বা লম্বা চিঠি।' আমার সেই চিঠি দেখে তারাও অবাক হয়ে যায়।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমার সেই 'চিঠি' শেষ হলো, ফটোকপি করে পাণ্ডুলিপিটি দেশে পাঠিয়েছি। উপন্যাসটির নাম দিয়েছি 'দীপু নাম্বার টু'। এখন

লেখা হলে এই নাম দেওয়া হতো কিনা সন্দেহ। কারণ এখন 'দুই নম্বরি জিনিস' বলতে খুব বাজে জিনিস বোঝায়, কিন্তু 'দীপু নাম্বার টু' একেবারেই বাজে ছেলে নয়! (কিছুদিন আগে দীপু নামে একজন সন্ত্রাসী করার পর একজন কলাম লেখককে সেই সন্ত্রাসীকে দীপু নাম্বার থ্রি বলে মশকরা করতে দেখেছি!) পাণ্ডুলিপিটি একজন প্রকাশককে পাঠালেও সেটি প্রথমে সম্ভবত 'কিশোর' নামক একটি ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল। সম্পাদক মহোদয় খুব নীতিবান মানুষ, তিনি আমার বইয়ের তারেক চরিত্রটির নানা অপকর্মকে খুব সুনজরে দেখলেন না—কিছু কিছু জায়গায় তাকে একটু সুবোধ বালক বানিয়ে দিলেন! শুধু তাই নয় উপন্যাসের একেবারে শেষ পৃথিবী-জীবন-সমাজ এসব নিয়ে খানিকটা ফিলোসফি নিয়ে এসে কিছু কিছু মহান কথাবার্তা ঢুকিয়ে দিলেন! তবে উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত যখন বই হিসেবে শিশু একাডেমী থেকে প্রকাশিত হলো তখন সেটি বের হলো আমি যেভাবে লিখেছি ঠিক সেভাবে, তারেকের সকল অপকর্মসহ-জীবন-সমাজ এবং পৃথিবী নিয়ে সকল মহান বক্তব্য ছাড়া! আমার নিজের লেখা পড়ে যদি মনে হয় সেটা অন্য কেউ লিখেছে তাহলে আমার ভারি অস্বস্তি হয়।

'দীপু নাম্বার টু' বইটি পাঠক পছন্দ করেছে কিনা যুক্তরাষ্ট্রে বসে আমি সেসব কোনো খবর পাইনি, তবে মোরশেদুল ইসলাম নামে একজন তরুণের চিঠি পেয়েছিলাম। সেই তরুণ আমার বইটি নিয়ে সিনেমা বানাতে চান। আমাদের দেশের সব তরুণই এ ধরনের স্বপ্ন দেখে এবং সেটা শেষ পর্যন্ত স্বপ্নই থেকে যায়। তারপরও আমি মনে করি স্বপ্ন দেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। আমি তাই সেই তরুণকে অনুমতি দিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম। যদিও পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম ব্যাপারটি আসলে কখনোই ঘটবে না।

মোরশেদুল ইসলাম সফল একজন চিত্র-পরিচালক হয়ে দেশে-বিদেশে খুব নাম করেছিলেন। তারপরও তিনি তার তরুণ বয়সের স্বপ্নের কথা ভোলেননি। খুব যত্ন করে তিনি 'দীপু নাম্বার টু' বইটির চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন—আমাদের দেশের অসংখ্য শিশু-কিশোর সেই ছবিটি দেখেছে। পানির ট্যাংকের দৃশ্যটি চিত্রায়িত করতে গিয়ে সেই কিশোর অভিনেতারা যে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়েছিল সেটি সম্পর্কে আমার যদি বিন্দুমাত্র ধারণা থাকত আমি তা হলে হয়তো সেটা লিখারই সাহস পেতাম না। আমার ধারণা, আমার বইটি পড়ে যত বাচ্চা আনন্দ পেয়েছে চলচ্চিত্রটি সরাসরি কিংবা টেলিভিশনে প্রচারিত হতে দেখে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ আনন্দ পেয়েছে।

কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, আমার খুব কঠিন একটা সময়কে ভুলে থাকার জন্য এই বইটি লিখে আমি যে আনন্দ পেয়েছি সেই আনন্দটুকু কিন্তু কেউ কখনো পাবে না।

দৈনিক প্রথম আলো, ২৬/৭/০২

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপাচার্য নাকি উপাচার্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়?

১.

খবরের কাগজের একটা ছবির কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। ছবিটি শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলার অবিশ্বাস্য ঘটনার পরের দিনের ছবি। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে একাধিক পুলিশ লাঠি হাতে মাটিতে বসে থাকা একটা মেয়েকে আঘাত করতে ছুটে যাচ্ছে। মেয়েটির চোখে-মুখে এক ধরনের অবর্ণনীয় আতঙ্ক, সে ভয়ার্ত মুখে হাত তুলে কোনোভাবে লাঠির আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। মেয়েটির কাছেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে আরো একটি মেয়ে, তার কী হয়েছে আমরা জানি না। এক সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগের মাঝে ক্যামেরার শাটার এই ছবিটিকে বন্দি করেছে। তার পর মুহূর্তে সেই লাঠিগুলো হয়তো মেয়েটিকে আঘাত করেছিল— মেয়েটি সম্ভবত অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছিল।

এই যে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সেটি কিন্তু শুধু শারীরিক যন্ত্রণা নয়। শারীরিকভাবে আঘাত করার মতো অমানবিক এবং অসম্মানজনক ব্যাপার পৃথিবীতে আর কী থাকতে পারে? একজন মানুষকে অবমাননা করার এর চেয়ে নিষ্ঠুর কোনো পদ্ধতি পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নেই। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যাপীঠে একজন ছাত্রীকে যখন পুলিশ এক ধরনের হিংস্র আনন্দ নিয়ে আঘাত করে, ঠিক সেই মুহূর্তে কি আমাদের এতদিনে গড়ে তোলা মানুষের ওপর মানুষের বিশ্বাসের এবং ভালোবাসার সেই জগতটিকে ভেঙেচুরে ফেলি না? আমাদের কি মনে হয় না যে, আমরা বুঝি সভ্য মানুষ নই—আমরা বর্বর অসভ্য জংলি একটি সম্প্রদায়?

আমি সেই ছবিটির কথা ভুলতে পারছি না, লাঠি দিয়ে একটি মেয়েকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করার সেই দৃশ্য মানুষ হয়ে মানুষকে অবমাননা করার সেই ভয়ঙ্কর ছবিটি ভোলা খুব সহজ নয়। দিনের বেলা ক্যামেরার সামনেই যদি পুলিশ এই নৃশংসতা করার সাহস পায় তাহলে রাতের অন্ধকারে শামসুন্নাহার হলের মেয়েদের ওপর কী ধরনের বর্বর হামলা করেছিল ভেবে আমি শিউরে

উঠি। একটি মেয়ের বাবা-মা কত স্নেহে কত আদরে তাকে বড় করে দেশের সবচেয়ে উঁচু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছেন পড়াশোনা করার জন্য, আর পুলিশ এসে তাদের গায়ের ওপর হাত তুলেছে? সেই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় অভিভাবকের সম্মতিতে, সহায়তায় এবং প্ররোচনায়? এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি?

খবরের কাগজের সেই ছবিটির কথা ভোলার আগেই আজকে খবরের কাগজ খুলে আমি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছি। আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন প্রিয় একজন মানুষ ড. আনোয়ার হোসেন মাটিতে পড়ে আছেন এবং পুলিশ লাঠি হাতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ড. আনোয়ার হোসেন এবং তাদের সব কয়জন ভাই মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে বীর প্রসবিনী মায়ের কাছে তারা সব ভাই ফিরে আসেননি। যে মাটির মাঝে ড. আনোয়ার শুয়ে পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন সেই মাটির স্বাধীনতার জন্য তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, তার ভাইয়েরা প্রাণ দিয়েছিলেন। খবরের কাগজের সেই ছবি দেখে কোনো মানুষ কি স্থির থাকতে পারে?

২.

কিন্তু মনে হচ্ছে অনেকেই স্থির হয়ে আছেন। যাদের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ বিস্ফোরণোন্মুখ তারা খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের কাছে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই, ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই—সব কিছু এক ধরনের শীতল হিসাব। খবরের কাগজে বিবৃতি দিচ্ছেন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন, ষড়যন্ত্রের চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছেন, ছাত্রীদের গার্মেন্টস কর্মী বলছেন এবং বিন্দুমাত্র সংকোচ বা দ্বিধা না করে সরাসরি মিথ্যা কথা বলছেন। তাদের সাহায্য করার জন্য পুরো সরকারি যন্ত্র এবং তাদের রাজনৈতিক দল এগিয়ে এসেছে। খবরের কাগজে যেসব তথ্য বের হচ্ছে সেগুলো অবিশ্বাস্য, সত্যি ঘটতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না।

শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের ওপর এই নির্যাতনের প্রতিবাদ করে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করেছে, কোনো লাভ হয়নি। পুলিশ তাদের ওপর হামলা করে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রচলিত নিয়ম ভেঙে উপাচার্য একা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীরা নিরুপায় হয়ে আমরণ অনশন করার জন্য শহীদ মিনারে আশ্রয় নিয়েছেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী শহীদ মিনার গুঁড়ো করে দিয়েছিল, সাম্প্রতিককালে শহীদ মিনারে কারো ওপরে হামলা

করতে শুনিনি, হয়তো সে জন্যই প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীরা এটাকে আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দুর্যোগকে মোকাবিলা করার জন্য দু'বছর আগে আমাদের ছাত্ররা ঠিক একইভাবে আমরণ অনশন শুরু করেছিল। ঠিক তার পরেরদিনই টেক বাংলার একটা কনফারেন্সে আমাকে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হয়েছে, সেখানে বসে আমি খাবার মুখে দিতে পারি না। টেলিফোনে আমার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমি সেই অনশনরত ছাত্রদের কথা শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম। চার দিনের অভুক্ত ছাত্রদের শুষ্ক বিবর্ণ শরীরে খিঁচুনি হচ্ছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে, জোর করে ধরে হাসপাতালে নিয়ে স্যালাইন দিতে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে কোনো একজন মারা পড়তে পারে, সবার মাঝে এক ভয়াবহ আতঙ্ক। সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এসে সেই ছাত্রদের অনশন ভাঙিয়েছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসে সেই সংবাদ শুনে দুঃস্বপ্নের অবসানে আমি যে আনন্দ পেয়েছিলাম সেই আনন্দের কথা আমি কখনো ভুলব না। ঠিক একইভাবে আবার সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন শুরু হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা শহীদ মিনারে অনশন করছে জেনে আজ সিলেট থেকে ঢাকায় এসেই আমি তাদের দেখতে গিয়েছিলাম। মানুষ কতটুকু নিরুপায় হলে এ রকম একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে আমি সেটা জানি। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর প্রতিবাদের ফল কী হবে আমি জানি না—যাদের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ তাদের ভেতরে সুস্থ বিচার-বিবেচনা নেই, তারা কেমন করে ভাবনা-চিন্তা করেন কেউ জানে না। কিন্তু তারপরও সেখানে গিয়ে সেই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাদের দুঃখকষ্টের খানিকটা ভাগ নিয়ে মৌখিক সমবেদনা তো জানাতে পারি।

শহীদ মিনারে যেতে গিয়ে প্রথমেই আমি যে জিনিসটা আবিষ্কার করেছি সেটি হচ্ছে সেখানে যাওয়ার প্রত্যেকটি পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পুলিশ কাউকে যেতে দিচ্ছে না। আমরা শেষ পর্যন্ত মেডিকেল কলেজের ভেতর দিয়ে শহীদ মিনারে এসেছি। শহীদ মিনারের পাদদেশে অভুক্ত অনশনরত ছেলেমেয়েরা শুয়ে আছে, তাদের অনেকের হাতে স্যালাইন। সামনে অনেকে জড়ো হয়ে গান গাইছে স্লোগান দিচ্ছে। বড় মানুষ কেউ নেই সবাই ছাত্রছাত্রী। তাদের কাউকে কাউকে আমি বিবিয়ানা লং মার্চে কিংবা মাগুরছড়া দিবসে দেখেছিলাম। আমি তাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে এসেছি। তাদের ক্ষোভের কথা শুনেছি পুলিশ নির্যাতন কী ধরনের হতে পারে তার বর্ণনা শুনে এসেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে ঘৃণার সেই রূপটি দেখে আমি হতবাক হয়ে গেছি। একজন মানুষ— যে কারণেই হোক যদি অন্য দশজনের ভেতরে এ রকম ভয়ঙ্কর ঘৃণার জন্ম দিতে পারে তা হলে সেই মানুষের

জীবনের কী অর্থ হতে পারে? ছাত্রদের জন্যই তো উপাচার্য এসেছেন। সেই ছাত্রদের ঘৃণার মাঝে গদিটুকু আঁকড়ে ধরে রাখার সম্মান কতটুকু?

৩.

এ ধরনের একটি ব্যাপার কেন ঘটেছে সেটি আমরা সবাই জানি। তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু পদটিতে একজন শিক্ষাবিদের নিয়োগ না দিয়ে একজন রাজনৈতিক মানুষকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। রাতের অন্ধকারে উপাচার্যের অফিস দখল করে তিনি কীভাবে সারা দেশের মানুষের কৌতুকের খোরাক হয়েছিলেন সেটি কেউ ভোলেনি—কিন্তু দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের সবচেয়ে উচ্চাসনে বসে থাকা মানুষটি আর যাই হন না কেন কিছুতেই কৌতুকের বিষয় হতে পারেন না। এই পদটি খুব সম্মানের পদ, ছাত্রছাত্রীদের বুক আগলে রক্ষা করে তাদের নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখানোর পদ। আমাদের খুব দুর্ভাগ্য, আমরা সেই ব্যাপারটি পুরোপুরি ভুলে যেতে বসেছি। একজন স্বাপ্নিক শিক্ষাবিদের পরিবর্তে রাজনৈতিক মানুষকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হলে যা ঘটার কথা ঠিক সেটাই আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে। উপাচার্য বুক আগলে তার দলের মানুষকে রক্ষা করেছেন, যারা তার দলের মানুষ নয় তাদের প্রতিপক্ষ ভেবে নির্মমভাবে শায়েস্তা করেছেন। এ ধরনের ঘটনা একদিন-দুদিন কেউ সহ্য করতে পারে কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে কেউ সহ্য করে যাবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক সেটাই ঘটেছে। সেখানকার পুঞ্জীভূত বারুদে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই আগুন কি সহজে কেউ নিভিয়ে দিতে পারবে?

৪.

উপাচার্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্টরের পদত্যাগেরও একটা দাবি উঠেছে, কার কতটুকু অপরাধ খবরের কাগজ পড়ে আমরা তার ভাসা ভাসা একটা ধারণা পাই; ঠিক হিসাবটুকু করতে পারি না। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের কথা উঠলে আমি একটা বিষয়ের কথা উল্লেখ না করে পারি না। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বসে থাকতে দেখলে তিনি এবং তার সহকর্মীরা নাকি তাদের কানে ধরে ওঠবোস করানোর মতো অসম্মানজনক শাস্তি দিতেন। আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন আমাদের ক্লাসের ছাত্রদের কোনো এক বেয়াদবির কারণে আমাদের আধপাগল একজন শিক্ষক পুরো ক্লাসকে একসঙ্গে কানে ধরে ওঠবোস করিয়েছিলেন—এতদিন পরও আমি সেই অপমানের কথা ভুলিনি এবং ঘটনাটির কথা মনে হলে এখনো আমি সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে এক ধরনের

অন্ধ আক্রোশ অনুভব করি। একজন মানুষ অত্যন্ত বিশাল একটি ব্যাপার, তাকে অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া যায়, কিন্তু কখনোই অসম্মান করা যায় না। একজন প্রক্টর একজন শিক্ষকও বটে, যে শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এ রকম একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে কানে ধরে ওঠবোস করাতে পারেন তার কি সত্যিই এত বড় একটা পদ দখল করে থাকার প্রয়োজন আছে? আমার কেন জানি বিশ্বাস হয় না।

ছাত্রছাত্রীদের ভেতরকার সম্পর্কের মাঝে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক ধরনের তালেবানি কালচার গড়ে উঠেছে সেটা কি সবাই লক্ষ করেছে? শুধু যে ছাত্র এবং ছাত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কের মাঝে পুলিশি খবরদারি শুরু হয়েছে তা নয়, সব রকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপর খুব ধীরে ধীরে হাত দেওয়া শুরু হয়েছে। যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল তারা হঠাৎ করে আবিষ্কার করছে এত সহজে তারা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে পারছে না, পদে পদে বাধা। একটা জাতিকে পশ্চাৎমুখী করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে তার সংস্কৃতিকে গলা টিপে হত্যা করা। আমার ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাংস্কৃতিক কাজকর্মে বাধা দেওয়ার এই ব্যাপারটি সম্ভবত জোট সরকারের শরিক জামায়াতে ইসলামীর অবদান।

৫.

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনার পরিবেশ নেই বলে ছাত্ররাজনীতি এবং শিক্ষকরাজনীতি দূর করার একটা সরকারি উদ্যোগের কথা প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনাটি প্রধানমন্ত্রীর সত্যিই সেই সদিচ্ছা আছে কিনা সেটি প্রমাণ করার সুযোগ এনে দিয়েছে। পুরো ব্যাপারটি শুরু হয়েছে একজন শিক্ষাবিদকে উপাচার্য পদে মনোনয়ন না দিয়ে দলীয় এবং রাজনৈতিক মানুষকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য। তিনি এসে চুটিয়ে রাজনীতি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। তাকে অপসারণ করে প্রথমবারের মতো দলহীন রংহীন সত্যিকারের একজন শিক্ষাবিদকে উপাচার্যের পদে মনোনয়ন দিয়ে একেবারে রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে রক্ষা করা সম্ভব। দ্রুত সেটি করে প্রধানমন্ত্রী প্রমাণ করতে পারেন পড়াশোনার ব্যাপারে তার সত্যিকারের সদিচ্ছা আছে।

সরকার কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে চুপচাপ বসে থেকে বেশ কিছু ছাত্রকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের

বর্তমান উপাচার্য এখন পর্যন্ত যেসব কাজকর্ম করেছেন, যেসব কথাবার্তা বলেছেন এখন তার আর জোর করে এই পদটিকে ধরে রাখার কোনো অর্থ নেই। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বুকের মাঝে তিনি যে ঘৃণার জন্ম দিয়েছেন তাকে বুঝতে হবে সেটি কোনো ষড়যন্ত্রের ফল নয় সেটি স্বতঃস্ফূর্ত। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে সেই ঘৃণার খানিকটা তিনি লাঘব করার চেষ্টা করতে পারেন। তাকে বুঝতে হবে যে সরকার তাকে এই পদ দিয়েছে যদি সেই সরকার মনে করে তার কোনো প্রয়োজন নেই তাকে জঞ্জালের মতো ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে। একটিবার হলেও তিনি যেন সত্যিকারের একজন শিক্ষকের মতো, ছাত্রছাত্রীদের সত্যিকারের অভিভাবকের মতো একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের মর্যাদাটুকু রক্ষা করেন।

এই মুহূর্তে অনশনরত ছাত্রছাত্রীরা অভুক্ত হয়ে দুর্বল দেহে শহীদ মিনারের পাদদেশে শুয়ে আছে। যখন এই লেখাটি ছাপা হবে তখন আরো কিছু সময় পার হয়ে যাবে—তার মাঝে কি আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের সেই ছাত্রদের, সেই সন্তানদের নিজেদের মাঝে ফিরে পাব? নাকি তাদের আরো মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেব?

৩০.৭.০২

পুনশ্চ : এ লেখা যখন ছাপার জন্য প্রেসে যাচ্ছে তখন জানা গেল উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী পদত্যাগ করেছেন। এ জন্য তাকে ধন্যবাদ।

দৈনিক প্রথম আলো, ১/৮/০২

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যু হয় কেমন করে—

আমি জানি না ব্যাপারটি সবাই লক্ষ করেছে কিনা—বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটিতে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্ব কথাটি জুড়ে দেওয়া আছে। ইংরেজিতে শব্দটি ইউনিভার্সিটি—যেখানে ইউনিভার্স শব্দটি আরো ব্যাপক, সেটি শুধু বিশ্ব নয়, গ্রহ, নক্ষত্র, নিহারিকা সবকিছু মিলিয়ে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! কীভাবে এই নামটি এসেছে আমার জানা নেই। কিন্তু এই নামের মাঝে যে একটা অত্যন্ত বিশাল ব্যাপার লুকিয়ে আছে সেটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এমন একটা শিক্ষাঙ্গন, যেটা একটা এলাকার বা অঞ্চলের নয়, সম্প্রদায় বা ধর্মের নয় এমনকি একটি জাতি বা দেশের নয়—এটি সারা পৃথিবীর। একজন ছাত্র বা শিক্ষক যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন সে হঠাৎ করে ছোট গণ্ডি থেকে মুক্ত হয়ে বিশাল পৃথিবরি অংশ হয়ে যায়। ক্ষুদ্রতা, নীচতা, আঞ্চলিকতা বা সংকীর্ণতা আর যেখানেই থাকুক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে পারে না।

আমাদের দেশে এক সময় অল্প কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, যার সবগুলোই ছিল পাবলিক বা সহজ ভাষায় 'সরকারি'। দেশে ছেলেমেয়েরা সেগুলোতে পড়াশোনা করত, তাদের পড়াতে যে খরচ হতো তার পুরোটাই সরকার দিত বলে ছেলেমেয়েরা বলতে গেলে একেবারে কোনো খরচ ছাড়াই পড়তে পারত। (এরকম একটা পদ্ধতি ছিল বলেই আমি পড়াশোন করে ডিগ্রি নিতে পেরেছিলাম!) আজকাল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, সেখানে খরচ দিয়ে পড়তে হয় এবং বলা যেতে পারে একটা ছেলে বা মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে কী ধরনের খরচ হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হওয়ার পর সবাই সেটা প্রথমবার বুঝতে পারছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বা তিন গুণ হবে—সত্যি কথা বলতে কী, এত দ্রুত তাদের সংখ্যা বাড়ছে যে সে হিসাব রাখা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যলয়গুলো পড়ানোর জন্য বেছে নিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি বা ব্যবসা প্রশাসনের মতো 'জনপ্রিয়' বিষয়—প্রায় সময়েই অন্য অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নেই। বলতে গেলে কারোরই নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই,

একটা দালান বা বিল্ডিংয়ের মাঝেই পুরো বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক ক্ষেত্রেই স্থায়ী শিক্ষক নেই। তবে নানা ধরনের সমস্যা থাকার পরও কিন্তু এই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যথেষ্ট। সবাই যে বড়লোকের ছেলেমেয়ে তাও নয়। চার বছরের মাঝে পাস করে বের হবে, পড়াশোনা করতে করতে গুলি খেয়ে মারা যাবে না কিংবা নিজের পছন্দের একটা বিষয় পড়তে পারবে সে জন্য অনেক মধ্যবিত্তের ছেলেমেয়েরাও খুব কষ্ট করে হলেও আজকাল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তারপরও কিন্তু বলা যায়, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার আসল ব্যাপারটি কিন্তু এখনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। আমাদের দেশের ইতিহাস বা ঐতিহ্যের, সাহিত্য সংস্কৃতি বা শিল্পের, প্রযুক্তি বা বিজ্ঞানের পুরোটুকুই এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবদান এবং আমার ধারণা দেশের ভবিষ্যৎ পুরোটাই নির্ভর করছে এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর, যেখানে এখনো দেশে মূল ধারার মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ছেলেমেয়েরা পড়তে আসছে। যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকেন তারা বলতে পারবেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিন্তু প্রাণহীন জড় পদার্থ নয়, এগুলো জীবন্ত প্রাণীর মতো। যারা খুব কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখেছেন তারা জানেন জীবন্ত প্রাণীর মতো এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

২.

রাতারাতি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যু হয় না—এর মৃত্যু হয় ধীরে ধীরে, একটা জীবিত প্রাণীর মতো। এর মৃত্যু প্রক্রিয়াটা শুরু হয় তার দেহে একটা ভয়ঙ্কর রোগের জীবাণু ঢুকিয়ে এবং সেই জীবাণুটি হচ্ছে একজন ভয়ঙ্কর রকম দলীয় ভাইস চ্যান্সেলর। আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দু' ধরনের অধ্যাদেশ আছে—এক ধরনের অধ্যাদেশে তিনজন ভাইস চ্যান্সেলরের একটা প্যানেল শিক্ষকরা ভোট দিয়ে ঠিক করেন, সেখান থেকে চ্যান্সেলর একজনকে বেছে নেন। অন্য অধ্যাদেশে সরকার থেকে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হয়। এগুলো অবশ্যি কথার কথা, আজকাল আর মানা হয় না। যে দেশের প্রেসিডেন্টকে ধমক দিয়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হয়, সেই দেশে ভাইস চ্যান্সেলরকে নিয়ম মেনে নিয়োগ দেওয়া হবে কে বলেছে? তাদেরকে যখন খুশি বসানো যায় যখন খুশি নামানো যায়। আইনকানুন বলে কিছু নেই। দরকার হলে এর-দুইশ বছরের পুরনো আইন দেখানো হয় কারো এ ব্যাপারে কোনো চক্ষুলজ্জাও নেই। কেউ যে সে ব্যাপার নিয়ে মামলা-মেকদ্দমা করবে

দেশে সেরকম পরিবেশও নেই। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন করে যে মানুষগুলো সেটা টেলিভিশনে ঘোষণা দেয় এই দেশ তাদেরও বিচার করতে পারে না, সেই দেশে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ নিয়ে কোন পাগল মামলা করতে যাবে?

বিশ্ববিদ্যালয় একটা বিশাল ব্যাপার, একটা সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয় একটা দেশকে গড়ে তুলতে পারে। কাজেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হতে হয় একজন বিশাল মাপের মানুষকে। সবার প্রথম তার হওয়ার কথা একজন সত্যিকার শিক্ষাবিদ, যিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন পড়াশোনা আর গবেষণার মাঝে। একই সঙ্গে তাকে হতে হয় একজন স্বাপ্নিক বা ভিশনারি, যেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে স্বপ্ন দেখাতে পারেন। তাকে একজন দক্ষ প্রশাসক হতে হয়, যেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল প্রশাসনকে চালিয়ে নিতে পারেন। পৃথিবীর সব দেশের জন্য এই তিনটি গুণ থাকলেই চলে, কিন্তু আমাদের দেশের ভাইস চ্যান্সেলরদের আরো কিছু বাড়তি গুণ থাকতে হয়—তাদের হতে হয় সাহসী, যেন রাজনীতির নোংরা ছোবলকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন, কাজে-কর্মে তাকে হতে হয় নিরপেক্ষ যেন দলীয় রাজনীতির উপরে থেকে তিনি বুক আগলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রক্ষা করতে পারেন।

কিন্তু আমাদের দেশে ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার জন্য এসব কোনো গুণাবলির প্রয়োজন হয় না। সেখানে তার মাত্র একটি বিশেষত্ব থাকতে হয়, তাকে একজন দলীয় মানুষ হতে হয়। তীব্রভাবে দলীয় ভয়ঙ্করভাবে দলীয়, ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব এখন আর কোনো মহান দায়িত্ব নয়, এখন সেই দায়িত্ব পুরোপুরি রাজনৈতিক সংগঠকের দায়িত্ব। এক সময় আমাদের ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পেছনে পেছনে মন্ত্রীরা ঘুরঘুর করতেন। আজকাল ভাইস চ্যান্সেলরা মন্ত্রীদের পেছনে ঘুরঘুর করেন। ইদানীং অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে, রাজনৈতিক দলের যুগ্ম সচিব বা রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের পেছনে যেতেও তাদের সংকোচ হয় না! রাজনৈতিক দলের যে রকম নানা ধরনের অঙ্গ সংগঠন থাকে বিশ্ববিদ্যালয় এখন সেরকম একটা অঙ্গ সংগঠন, সেটাকে জোরদার করার দায়িত্ব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলররা কাজ করতে আসেন। কেউ যেন মনে না করেন আমি ক্ষুব্ধ হয়ে একটা বড় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারকে খাটো করার চেষ্টা করছি—আমি সরকারি মন্ত্রণালয়ের এক সভায় একাধিক ভাইস চ্যান্সেলরের উপস্থিতিতে একজন

ভাইস চ্যান্সেলরকে এই কথা বলতে শুনেছি। এর মাঝে এখন আর কোনো লুকোছাপা নেই—এটি এখন গর্ব করে দশজনের সামনে বলা যায়।

৩.

বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন একজন ভয়ঙ্কর রকম দলীয় ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ দেওয়া হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তার প্রথম দায়িত্ব হয় তার দলকে গুছিয়ে নেওয়া, পড়াশোনা তার প্রথম দায়িত্বের মাঝে পড়ে না। রাজনৈতিক দল যেভাবে নিজের ক্ষমতা সুসংহত করে অন্য দলকে নিপীড়ন করে ঘরছাড়া করে দেয়, এখানেও তাই শুরু হয়। প্রক্টর এবং প্রভোস্ট এই জাতীয় পদগুলোতে সবচেয়ে কার্যকর মানুষদের না দিয়ে দলীয় মানুষদের দেওয়া হয়। এরা সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কাজকর্ম করেন, তাদের একটা বড় দায়িত্ব হয় দলীয় ছাত্রদের রক্ষা করা। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু সন্ত্রাসী ছাত্ররা যেন হলের 'স্ট্র্যাটেজিক' রুমগুলোর দখল পায়, যেখান থেকে হলে আক্রমণ করা যায়, পালিয়ে যাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। অস্ত্র আনা-নেওয়ার জন্য জানালার রড কাটা, রুমগুলোতে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। ছাত্ররা হচ্ছে রাজনৈতিক দলের বড় শক্তি—তাদের হাতে রাখতে হয়, তাদেরকে ব্যবহার করা হয়। আমার মনে আছে একবার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলমাল হয়েছে, পুলিশের বড় কর্তা একদল পুলিশ নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। এক সময় বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে ছাত্র নেতাদের পাঠিয়ে দেন এখন তাদের সঙ্গে কথা বলে প্ল্যান ঠিক করি।' আমরা আকাশ থেকে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ছাত্র নেতাদের? তারা কী করবে?' পুলিশের কর্মকর্তা বললেন, 'তারাই তো সামনে থেকে মারদাঙ্গা করবে, আমরা পেছনে থেকে প্রটেকশন দেব!' কেউ যেন মনে না করেন আমি রসিকতা করছি—আমি নিজের কানে শুনেছি। আজকাল এটি প্রায় রুটিন ব্যাপার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বুয়েটে পুলিশ প্রটেকশনে সরকারি দলের ছাত্রদের হামলার ছবি এবং খবর কাগজে ছাপা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ব্যাপার ঘটছে—একটু দূরে বলে খবরের কাগজে সেভাবে আসছে না।

দলীয় সন্ত্রাসীদের শুধু যে লালন করা হয় তাই নয়, তাদেরকে ধীরে ধীরে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়—তারা যত অকর্মই করুক তাদেরকে কখনো শাস্তি দেওয়া হয় না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন তিনজন শিক্ষকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার পর সন্ত্রাসী ছাত্রদের শাস্তি দেওয়ার জন্য সব শিক্ষক মিলে ক্লাস বর্জন পর্যন্ত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তদন্ত কমিটির সব কাজকর্ম পুরোপুরি ধামাচাপা পড়ে গেছে!

প্রভোস্ট-প্রক্টর এই ধরনের পদগুলোতে নিজেদের মানুষ দেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিগুলোতে শুদ্ধি অভিযান চালানো শুরু হয়। গুরুত্বপূর্ণ সব কমিটিতে সরকার থেকে সদস্য দেওয়া হয়—সেখানে ঘোরতর রাজনৈতিক মানুষেরা আসেন। কিছু সদস্যদের নির্বাচন করে আসতে হয়, সেই নির্বাচনগুলোও একেবারে রাজনৈতিক দলের দক্ষতা দিয়ে করা হয়—প্রায় সময়েই সরকারি দলের প্রার্থীরা জিতে আসেন এবং কমিটিগুলো হয় পুরোপুরি নিজেদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমিটি হচ্ছে সিন্ডিকেট—সেটা পুরোপুরি দখল করতে না পারলেও বেশির ভাগ সদস্যই নিজেদের থাকে বলে প্রয়োজনে স্টিম রোলার চালিয়ে দেওয়া যায়।

পৃথিবীর সব জায়গাতেই কিছু সুবিধাবাদী মানুষ থাকেন—এরকম সময়ে তারা খুব তৎপর হয়ে ওঠেন। মোটামুটিভাবে চাটুকার ধাঁচের কিছু শিক্ষক-কর্মকর্তা তৈরি হয়ে যান—তারা ভবিষ্যতের ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার জন্য শিক্ষানবিসি শুরু করে দেন—দলবাজিতে হাত পাকাতে শুরু করে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ মানুষ হঠাৎ করে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন, মানুষগুলো যদি সৎ না হন তাহলে হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে একেবারে ভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হতে শুরু করে।

এই নানা ধরনের দজ্ঞযজ্ঞতে পড়াশোনার ব্যাপারটি চাপা পড়ে যায়। বড় ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে অনেক শিক্ষক থাকেন, সেখানে ক্লাস চলতে থাকে। তবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা খুব কম এবং নানা রকম কায়দা-কানুন করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়, সেখানে খুব ক্ষতি হয়। পড়াশোনা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো কাউকে বলার সুযোগ থাকে না, একাডেমিক কাউন্সিলগুলোর সভা ডাকা হয় না, সভা ডাকলেও এজেন্ডাগুলো উঠে আসে না—সব মিলিয়ে একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা হয়ে যায়। বলতে লজ্জাও করে আবার না বলেও পারছি না—এই ধরনের একটা চূড়ান্ত উদাহরণ আছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, একটি বিভাগে মাত্র পাঁচজন শিক্ষক ছয় ব্যাচের ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, সেই শিক্ষকরা কীভাবে কত ঘণ্টা ক্লাস নেন আমার জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না। শিক্ষকসংখ্যা বাড়ানোর উপায় নেই, সরকারি বিধি-নিষেধ আছে। যারা এই বিধিগুলো তৈরি করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপিয়ে দেন তারা সবকিছু জানেন, শুধু একটি জিনিস জানেন না, সেটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে ছাত্রদের পড়ানো এবং শিক্ষক ছাড়া ছাত্রদের পড়ানো যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ব্যাপারটি যখন এত গুরুত্বপূর্ণ থাকে না তখন সেখানে এক ধরনের স্থবিরতা এসে যায়। কোন বিভাগে কত শিক্ষক, কে

কীভাবে পড়াচ্ছেন, কতগুলো ল্যাবরেটরি, সেই ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি আছে কিনা—সেসব ব্যাপার আর গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। কুকুর বা বিড়ালকে ট্রেনিং দেওয়ার একটা পদ্ধতি আছে, যেটা করানো চেষ্টা করা হয় সেটা করতে পারলে পুরস্কার, না করতে পারলে শাস্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা শুরু হয়ে যায়—যে বিভাগের শিক্ষকরা যত বেশি দলবাজি করতে পারবেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে তত বেশি সুযোগ পাবেন। যারা বিতৃষ্ণা দেখাবেন তারা কিছুই পাবেন না, তাদের ল্যাবরেটরি হবে না, শিক্ষক নিয়োগ হবে না।

মানুষের শরীরে রোগ সংক্রমণ হলে শরীর প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই হয়। একটা দল যখন বাড়াবাড়ি শুরু করে দেয় তখন বেঁচে থাকার জন্য অন্য দলও সংঘবদ্ধ হয়। দুই দলে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ দেখতে দেখতে বিষাক্ত হয়ে যায়, সেটি একটি অসুস্থ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়—কেউ জানে না যে সেটি তখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে।

৪.

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তার ছাত্রছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীরা যখন ক্লাসের বিরতিতে এক ক্লাসরুম থেকে অন্য ক্লাসরুমে যেতে থাকে—প্রাণোচ্ছ্বল ছাত্রছাত্রীদের সেই ছুটোছুটি থেকে সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে আর কী হতে পারে? পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর প্রশাসন যখন কুৎসিৎ একটা দলীয় ব্যাপারে আটকা পড়ে তখন ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রীরাও সেটা টের পেতে শুরু করে।

শুধু যে তাদের পড়াশোনার ক্ষতি হয় তা নয়—তাদের দৈনিন্দিন জীবনেও তার ছোবল এসে লাগতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার একটা ব্যাপার আছে। সেজন্য তাদের খেলাধুলা, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি কিংবা নেহাত বিনোদন—এইসব ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হয়। একটি ছাত্র সংসদ নির্বাচিত হয়ে এসব ব্যাপারে নেতৃত্ব দেবে এরকম একটা ধারণা এক সময় কাজ করলেও আজকাল সেটি কোথাও কাজ করে না। এখন কার ঘাড়ে দু'টি মাথা আছে যে ছাত্র সংসদের নির্বাচন দেবে? কাজেই খেলাধুলা, শিল্প সাহিত্য বা সংস্কৃতি এই ব্যাপারগুলো গড়ে ওঠে সমমনা কিছু ছাত্রছাত্রীর উদ্যোগে। তারা নানা ধরনের সংগঠন করে নানা ধরনের অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি করে রাখে।

মৌলবাদী ধরনের দলীয় একজন ভাইস চ্যান্সেলর কলমের এক খোঁচায় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিতে পারেন। বাংলাদেশের প্রগতিশীল রূপটি বাঁচিয়ে রাখতে পারে এই দেশের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীরা এবং একটি দেশকে তালেবানি দেশে পাল্টে দেওয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে তার সাংস্কৃতির সব পথ বন্ধ করে দেওয়া। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্মস্থান। কাজেই একজন তালেবান ধাঁচের ভাইস চ্যান্সেলর এসে তার নিজের মানুষদের নিয়ে প্রথমেই সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। অনেক জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য ছাত্রনেতাকে চাঁদা দিতে হয়, চাঁদা না দিলে অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়। প্রক্টর এবং শিক্ষকরা সাহায্য না করলে ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠান করতে পারে না। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য নানা ধরনের ছলছুতো করা হয়, ধানাই-পানাই করা হয় এবং একসময় সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের ওপর চড়াও হয়ে সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়। 'আমি দেখে নেব তুমি কেমন করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক করো।' অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, শিক্ষকদের মুখ থেকে ছাত্রদের এরকম কথা শুনতে হয়। এ ব্যাপারে অবশ্যি সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে বড় রেকর্ড আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, সত্যজিৎ রায়ের কিছু ছবি দেখানোর ছাত্রদের একটা উদ্যোগকে খুব সুকৌশলে এখানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক চর্চা করার অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়া হয়, তখন নিজের অজান্তেই সেই অসুস্থ বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্যুর দিকে আরো কয়েক পা অগ্রসর হয়ে যায়।

৫.

বিশ্ববিদ্যালয় দলবাজির চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছানোর পর সেখানে একটি ভিন্ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। কোনো মহান আদর্শ নিয়ে এখানে কেউ সংঘবদ্ধ হয়নি—দলীয় ভাগাবাটোয়ারাই হচ্ছে মূল কথা, তখন নিজেদের মাঝে সেটা নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে যায়। যেখানে কখনো দুর্নীতি ছিল না সেখানে দুর্নীতি মাথা তুলতে থাকে। দল করলেই যদি ভাগ বাটোয়ারায় অংশ পাওয়া যায় তখন সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজরা এসে দলে নাম লেখাতে থাকেন। সৎ মানুষেরা সমস্যা করলে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আর সাক্ষী-প্রমাণের দরকার হয় না। দলীয় পত্রিকায় যে-কোনো মানুষের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে ছাপিয়ে তাকে সামাজিকভাবে অপদস্থ করা হয়, সেটা কখনো প্রমাণিত না হলেও ক্ষতিটুকু ঠিকই হয়ে যায়। (এই সপ্তাহেই স্থানীয় কাগজে অন্য অনেকের সঙ্গে আমার চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করে একটা কুৎসিৎ লেখা বের হয়েছে।)

বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ কাজ করতে উৎসাহ পায় না, কখন কার বিরুদ্ধে কী করা হবে সেই ভয়ে সবাই শঙ্কিত হয়ে থাকেন। শিক্ষকরা হতোদ্যম হয়ে যান, তখন একজন একজন করে শিক্ষক সেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে থাকেন। সবার আগে যান সবচেয়ে ভালো শিক্ষকরা। কারণ তাদের নতুন জায়গায় কাজ পাওয়া হয় সবচেয়ে সহজ। তরুণ শিক্ষকরা বাইরে পিএইচডি করতে গিয়ে আর ফিরে আসেন না। ভালো শিক্ষকরা চলে যাওয়ার পর তাদের জায়গা দখল করেন অযোগ্য শিক্ষকরা। দলবাজি করার খাতিরে নিজের দলের ছাত্রদের বেশি মার্কস দিয়ে ভালো রেজাল্ট করিয়ে নিয়ে আসেন। কিছুদিনের ভেতর তারা একটা সংঘবদ্ধ চক্র হয়ে যান—কার সাধ্যি আছে সেই চক্র ভেদ করে?

ধীরে ধীরে অবস্থা আরো খারাপ হয়। ছাত্র ভর্তি করার সময় নিজের দলের ছাত্রদের ভর্তি করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন গোপনে বিলি করা হয়। দলীয় শিক্ষক, দলীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে দলীয় ছাত্রদের সঙ্গে সময় কাটান। আনন্দহীন, স্বপ্নহীন উদ্যমহীন কিছু মানুষ বিশ্ববিদ্যালয় নামক একটি এলাকায় ঘুরে বেড়ান। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না যে বিশ্ববিদ্যালয়টির মৃত্যু ঘটে গেছে, কেউ জানবে না দেশের জন্য মমতাহীন কিছু মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই মৃতদেহকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

৬.

কোনো নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনে রেখে আমি এটি লিখিনি—দেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে আমার সামনে যে ছবিটি ফুটে এসেছে সেটাই লিখেছি। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা মানুষকে খাটো করা আমার উদ্দেশ্য নয়, একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরোপুরি দলীয়করণ করতে দিলে কী হতে পারে ভয়াবহ ছবিটি দেখানো আমার উদ্দেশ্য।

তবে কেউ যেন মনে না করে এটিই শেষ কথা। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই আছেন নিবেদিতপ্রাণ, ত্যাগী, তেজস্বী, জ্ঞান তাপস শিক্ষকরা, আছে অসম্ভব প্রাণশক্তিতে ভরপুর অদম্য উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা। আমি নিশ্চিত, তারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আবার নতুন প্রাণে সঞ্জিবিত করবে।

সেই প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে—আর কেউ সেটি জানুক বা না জানুক, আমি সেটা জানি।

দৈনিক প্রথম আলো, ২৬/৯/০২

প্রবাসে দ্বিতীয় প্রজন্ম : সম্ভাবনা এবং সমস্যা

১.

আমি প্রায় দুই বৎসর পর যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি। কোনো একটা কাজে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ফ্রীওয়েতে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছি তখন হঠাৎ করে পিছন থেকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমার ছেলে বলল, 'আব্বু আমি শেষ পর্যন্ত এখন বুঝতে পেরেছি তোমরা কেন দেশে ফিরে গিয়েছ।'

তার কথা শুনে আমি একটু চমকে উঠলাম, জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

'আসলে, তোমরা তোমাদের নিজেদের মানুষের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছ।'

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। আমার ছেলে বলল, 'আমার কী মনে হয় জান?'

'কী?'

'তোমরা আসলে ঠিক কাজটিই করেছ।'

আমি রিয়ার ভিউ মিররে আমার ছেলের মুখটি দেখতে চেষ্টা করলাম, সেখানে তার বয়সের সাথে বেমানান এক ধরনের গাম্ভীর্য।

আজ থেকে প্রায় আট বৎসর আগে আমি এবং আমার স্ত্রী আমাদের দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে যাব বলে মনস্থির করে রেখেছিলাম। যাচ্ছি যাব করতে করতে হঠাৎ একদিন দেখি আমার ছেলের বয়স আট, মেয়ের বয়স ছয়, আর দেরী করলে কখনোই দেশে ফেরা যাবে না বলে এরকম জোর করেই দেশে ফিরে গিয়েছিলাম।

দেশে ফিরে আমি দু'টি খুব বড় বড় সত্যি আবিষ্কার করেছিলাম। প্রথমটি হচ্ছে আঠারো বৎসর পরে হলেও আমি ফিরে এসেছি আমার নিজের দেশে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার ছেলে এবং মেয়ে নিজের দেশ ছেড়ে এসেছে বিদেশে। আমি গত আঠারো বৎসর যেরকম আকাশ কালো করে আসা ঝমঝমে বৃষ্টি, ব্যাঙের ডাক, উথাল পাথাল জোৎস্নার জন্য বুভুক্ষ হয়েছিলাম আমার ছেলেও নিজের দেশ ছেড়ে বাংলাদেশে এসে ঠিক সে রকম তার দেশের স্কুল, খেলার সাথী, ডিজনিল্যান্ড, ম্যাকডোনাল্ড আর হেলোইনের রাতের জন্য বুভুক্ষ হয়ে পড়ল। যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রতিষ্ঠানে আমি শেষ কয়েক বছর কাজ করেছি তাদের

সাথে আমার এক ধরনের যোগাযোগ ছিল সেই সূত্রে গবেষণার কাজে আমি প্রায় প্রতি বছর সবাইকে নিয়ে একবার করে যুক্তরাষ্ট্রে আসছিলাম। তারা সেখানে তাদের পুরনো পরিবেশে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছে এবং যখন দেশে ফেরার সময় হয়েছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্লেনে উঠেছে। আমরা এসেছি আমার দেশে, তারা এসেছে প্রবাসে।

বাংলাদেশের মাটিতে গত আট বছরে আমাদের অভিজ্ঞতা ঠিক সাদামাটা অভিজ্ঞতা নয়, যে-কোনো হিসেবেই এটা চমকপ্রদ এবং ঘটনাবহুল। কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ছাত্রেরা আমাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে রেখেছে, কখনো অবরুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে আটকা পড়ে আছি, মৌলবাদীরা ঘেরাও করে রেখে খুন করার হুমকি দিচ্ছে। বাসায় বোমা মারছে। আবার একই সাথে হাজার হাজার মানুষের ভালোবাসায় সহমর্মিতায় আপ্লুত হচ্ছি। বাংলাদেশের মাটিতে সেখানকার দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার সাথে সাথে আনন্দ এবং ভালোবাসার ভাগীদার হতে হতে এক সময় লক্ষ করলাম আমার ছেলে এবং মেয়েও খুব ধীরে ধীরে দেশটিকে নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। সেখানে তাদের একটি জীবন তৈরি হয়েছে, তাদের প্রিয় মানুষ, প্রিয় আত্মীয়স্বজন, প্রিয় বন্ধু বান্ধব, স্কুল, খেলার মাঠ নিয়ে সেই জীবনটিও কম মধুর নয়। আমি যে-রকম আমার নিজের মানুষের কাছে ফিরে এসেছি, ঠিক সে-রকম তারাও আবিষ্কার করতে শুরু করেছে এই মানুষগুলো তাদেরও নিজের মানুষ। তারা একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরীতে যাবার জন্য ভোর রাতে ওঠে বসে থাকে, পয়লা বৈশাখে রমনার বটমূলে গান শুনতে যায়, বইমেলায় ঘুরে বেড়ায়, ওয়ার্ল্ডকাপ খেলায় বাংলাদেশের পক্ষে চিৎকার করে গলা ভেঙে ফেলে। আট এবং ছয় বছরের দু'জন শিশুকে তাদের শিকড় উপড়ে আমি একটি ভিনদেশে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সুদীর্ঘ আট বছরে সেই দেশের মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে সেই দেশের জল হাওয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত দেশটিকে নিজের আপন দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এই দেশের সাফল্য এখন তাদের সাফল্য এই দেশের দৈন্যতা এখন তাদের দৈন্যতা।

কাজেই আমি যুক্তরাষ্ট্রে এসে খুব অবাক হয়ে যাই যখন দেখি একজন প্রবাসী বাবা কিংবা মা এই দেশে জন্ম নেয়া এবং বড় হওয়া সন্তানের কাছে নিজের ফেলে আসা দেশ, দেশের ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি পুরোপুরি আনুগত্য দাবি করে বসে থাকেন। প্রথম প্রজন্মের বাবা-মা নিজের দেশকে ছেড়ে এসে সবসময় তাদের বুকের মাঝে একটি গভীর বিষাদ এবং যন্ত্রণা অনুভব করে এসেছেন, কিন্তু সেই বিষাদ যন্ত্রণা এবং হাহাকার তাদের

ছেলেমেয়ের বুকে থাকার কথা নয়। তাদের নিজেদের একটি জন্মভূমি আছে সেই জন্মভূমির জন্য তাদের বুকে একটি গভীর ভালোবাসা আছে সেটিই সত্যি এবং সেটিই স্বাভাবিক। প্রবাসে প্রথম প্রজন্মকে এই সত্যটি গ্রহণ করে নিতে হবে।

২.

এই লেখাটির শিরোনাম 'প্রবাসে দ্বিতীয় প্রজন্ম : সমস্যা ও সম্ভাবনা'- শিরোনামটি আমার দেয়া নয় আমাকে এই শিরোনামে লিখতে বলা হয়েছে। সত্যি বলতে কী আমাকে যদি এই বিষয়ের ওপর লিখতে বলা হতো তা হলে লেখার শিরোনামটি হতো 'স্বদেশে দ্বিতীয় প্রজন্ম : সমস্যা এবং সম্ভাবনা'। কারণ দ্বিতীয় প্রজন্ম কিন্তু প্রবাসে নেই, তারা স্বদেশেই আছে। তাদের বাবা-মা এক সময় দেশ ছেড়ে প্রবাসে এসেছিলেন তারা আসেনি। আমার বিবেচনায় মনে হয় দ্বিতীয় প্রজন্মের সত্যিকারের সমস্যা মাত্র একটি—সেটি হচ্ছে তারা যে দেশে এবং যে পরিবেশে বড় হচ্ছে তাদের বাবা-মায়েরা অনেক সময় সেটা বুঝতে পারেন না। তাদের বাবা-মায়েরা দেশ ছেড়ে আসার সময় নিজের বুকের ভেতরে যে দেশটির স্মৃতি ধরে রেখেছিলেন যে ভাষা এবং সংস্কৃতির কথা ভেবে তারা এখনো ব্যাকুল হন সেই স্মৃতি ভালোবাসা এবং আবেগটুকু তারা জোর করে তাদের ছেলেমেয়ের বুকের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিতে চান। এই দেশের এই কালচারে অন্য ছেলেমেয়েরা যা করতে চায় এবং যা করতে পারে দ্বিতীয় প্রজন্মের বাবা মায়েরা অনেক সময় সেটা তাদের করতে দেন না। শুধু যে নিজের সংস্কৃতির জন্য ভালোবাসা তা নয়, অনেক সময় সেটি হয়ে দাঁড়ায় অন্যের সংস্কৃতির প্রতি বিতৃষ্ণা। বৈচিত্র যে সৌন্দর্য সেই সত্যটি হঠাৎ করে ভুলে যেতে শুরু করেন।

৩.

দ্বিতীয় প্রজন্মের সমস্যা নিয়ে লেখার কথা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা সমস্যাটি দ্বিতীয় প্রজন্মের নয় সমস্যাটি আসলে প্রথম প্রজন্মের। আমাদের দেশে বিদেশ নিয়ে একটা বড় ধরনের মোহ আছে। জন্মের পর থেকেই আমাদের সবার মাঝে নানাভাবে একটা ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া হয় যে নিজের দেশটি তুচ্ছ এবং এই তুচ্ছ অকিঞ্চিতকর দেশের বাইরে 'বিদেশ' নামে একটি বিশাল জগৎ আছে যেটি হচ্ছে স্বপ্নের দেশ। সাধারণ অশিক্ষিত দরিদ্র বা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য সেই স্বপ্ন হয়তো অর্থবিত্ত এবং খানিকটা স্বচ্ছলতা,

মধ্যবিত্তের জন্য সেই স্বপ্ন হয়তো আরেকটু বড়—জীবনের নিরাপত্তা, সন্তানের পড়াশোনার নিশ্চয়তা, বাঁধাধরা একটি সুন্দর জীবন। যারা প্রতিভাবান এবং মেধাবী তাদের স্বপ্ন আরো ব্যাপক—সেটি জ্ঞান-বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি কিংবা শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা কিংবা গবেষণা। সবাই কোনো-না-কোনো ভাবে সেই স্বপ্নের পিছনে ছুটছে, কারো কারো হাতে স্বপ্নের সেই সোনার হরিণ ধরা দিয়েছে—কারো হাতে দেয়নি। যাদের হাতে ধরা দিয়েছে তাদেরও অনেকে দেখেছে আসলে তারা ভুল সোনার হরিণের পিছনে ছুটছেন। সত্যিকার সোনার হরিণ কোথায় তাদের জানা নেই—পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠে যে দেশকে ছেড়ে এসেছেন সেই দেশের জন্য এক গভীর ভালোবাসা অনুভব করে তারা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

দেশের জন্য গভীর মমত্ববোধ থেকে কারো কারো বুকে আবার এক ধরনের অপরাধবোধ জন্ম নেয়। যে দরিদ্র দেশ তার সীমিত সম্পদ দিয়ে তাদের পড়াশোনা করিয়ে শিক্ষিত করেছে সেই দেশের জন্য নিজের শ্রমটুকু দিতে না পারার জন্য এই অপরাধবোধ তাদের কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে থাকে। কেউ কেউ সাহস করে সেই অপরাধবোধের মুখোমুখি হন, তার একটা সমাধান খোঁজেন। প্রবাসে থেকেও দেশের জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ সেই অপরাধবোধকে স্বীকার করতে চান না, তারা দেশের নানা সমস্যার কথা টেনে আনেন, দেশের সকল সীমাবদ্ধতার কথা বড় গলায় ঘোষণা করেন, দেশকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, গালাগাল করেন এবং সেই 'জঘন্য' দেশ থেকে মুক্তি পেয়েছেন বলে নিজের ভাগ্যকে অভিনন্দন জানান।

পৃথিবীর এবং মহাকালের প্রেক্ষাপটে দেখলে এই পুরো ব্যাপারটুকুই কিন্তু খুব স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। আমরা যদি মানব সভ্যতার ইতিহাস পড়ি তা হলে দেখব পৃথিবীর সভ্যতাই এভাবে গড়ে উঠেছে। মানবগোষ্ঠী নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য সেই প্রাচীনকাল থেকে নতুন জায়গায় পাড়ি দিয়ে এসেছে। যখন পৃথিবী পাসপোর্ট, ভিসা ইমিগ্রেশন এসবের বেড়াজালে আটকা পড়ে ছিল না তখন মানুষ প্রয়োজন হলেই নতুন একটি জীবনের জন্য পাহাড় পর্বত সমুদ্র মরুভূমি পার হয়ে গিয়েছে, হিংস্র জন্তুর সাথে যুদ্ধ করেছে, ভিন্ন মানুষের সাথে লড়াই করেছে। উন্নত সভ্যতা হলে অনুন্নত সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সেই হিসেবে নিজের এবং নিজের সন্তানকে একটা ভালো জীবন উপহার দেবার জন্য কেউ যদি নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে হাজির হয়, নতুন দেশকে নিজের নতুন দেশ হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে তার মাঝে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। সেটি দেশপ্রেমের

ঘাটতি প্রমাণ করে না এবং কোনোভাবেই অপরাধ নয়। আমি যখন আশীর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম তাইওয়ানের মানুষেরা তাদের দেশে ফিরে যেতে শুরু করেছে—একটু খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম তাইওয়ানে একজন মানুষের বার্ষিক আয় বা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যুক্তরাষ্ট্রের সমান হয়ে গেছে, কাজেই দেশে ফিরে যাওয়া তাদের জন্য কোনো ধরনের আত্মত্যাগ নয়। আমরা সব সময়েই তথ্য-প্রযুক্তিতে ভারতবর্ষের উদাহরণ দিই, সেটাও গড়ে উঠেছে প্রবাসী ভারতবাসীর আন্তরিক চেষ্টায়। আমি নিশ্চিত যদি বাংলাদেশেও খানিকটা স্থিতি অবস্থা এসে যায়, আইন-শৃঙ্খলা সহ্যসীমার ভেতরে চলে আসে এবং ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার মানটুকু মোটামুটি গ্রহণযোগ্য অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে দলে দলে না হলেও অনেকে দেশে ফিরে যাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা তথ্য-প্রযুক্তির এই বিস্ময়কর সময়ে সারা পৃথিবী হঠাৎ করে ছোট হয়ে এসেছে, দূরত্ব আর দূরত্ব নয়, দেশের সীমানা একটা আনুষ্ঠানিকতার মতো। একজন মানুষ এক সাথে একাধিক দেশে থাকতে পারে, নিজের দেশকে ত্যাগ না করেই অন্য দেশকে গ্রহণ করতে পারে।

৪.

দ্বিতীয় প্রজন্ম নিয়ে লেখার কথা, কিন্তু ঘুরে ফিরে শুধু প্রথম প্রজন্মের কথাই বলা হলো। আমার ধারণা প্রথম প্রজন্ম যদি দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্য কোনো সমস্যা তৈরি করে না দেয় তাদের সত্যিকারের কোনো সমস্যা নেই। আমি সমাজ বিজ্ঞানী নই তাই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে পারব না কিন্তু আমি নিশ্চিত সব বাবা মায়েই চায় ছেলেমেয়েরা যেন তাদের মতো হয়। এখানে একটি পরিমিতি বোধের ব্যাপার আছে। 'ভিন্ন' মানেই খারাপ এই সত্যটি জানার ব্যাপার রয়েছে। আমরা যে সামাজিক ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ধরে নিই সেটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য সামাজিক ব্যবস্থা। দক্ষিণ ভারতে বড় বোনের মেয়েকে বিয়ে করার রীতি আছে শুনে আমি শিউরে উঠেছিলাম। আমাদের দেশে চাচাতো ফুপাতো খালাতো ভাইবোনেরা বিয়ে করে শুনে আমার আমেরিকান বন্ধুরা ঠিক একইভাবে শিউরে উঠেছিল। কাজেই ভালো মন্দের বিচারে গেলে অনেক সমস্যা। পৃথিবী চমৎকার একটি জায়গা; একেক জাতি, একেক সম্প্রদায়ের একেক রকম আচার ব্যবহার। একজনের নিয়মরীতি অন্যজন থেকে ভিন্ন এবং এই বৈচিত্রটাই হচ্ছে পৃথিবীর সৌন্দর্য। অন্যের আচার ব্যবহার নিজের জীবনে গ্রহণ করতে না পারি কিন্তু কখনোই যেন সেটাকে

অশ্রদ্ধা না করি। বৈচিত্রের সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো উদারতা যেন আমাদের থাকে।

কাজেই প্রথম প্রজন্মের প্রবাসীরা যদি দ্বিতীয় প্রজন্মের উপর বিশ্বাস রেখে তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে বড় হতে দেয় আমার ধারণা তারা চমৎকার মানুষ হিসেবে বড় হবে। যদি তাদের থেকে অন্ধ এক ধরনের মানুষ আশা করা হয়, কখনোই সেটি পাবে বলে মনে হয় না। যে দেশ তারা দেখেনি, যে মানুষের সাথে তাদের যোগাযোগ নেই, যে কালচার তাদের কাছে অপরিচিত সেই দেশ মানুষ বা কালচারের জন্য তাদের ভেতরে গভীর কোনো মমত্ববোধ থাকার কথা নয়। তবে বাবা-মায়ের সাথে যদি খুব সহজ একটা সম্পর্ক থাকে খুব আন্তরিক একটা শ্রদ্ধাবোধ জন্মে তা হলে বাবা মায়ের প্রতি গভীর ভালোবাসায় তাদের দেশ, তাদের মানুষ এবং কালচারের জন্য একটি মমত্ববোধের জন্ম হতে পারে। তখন যদি শিকড়ের সন্ধানে তারা তাদের পূর্বপুরুষের খোঁজ নিতে আগ্রহী হয়—হয়তো প্রথম প্রজন্মের স্বপ্ন খানিকটা সফল হতে পারে।

সেই স্বপ্ন সফল না হলেই ক্ষতি কী? পৃথিবীর সব মানুষই কী একই রক্ত মাংসের মানুষ নয়? দেশ নামক বিভাজনটি কী খুবই কৃত্রিম একটি বিভাজন নয়?

পড়শী, অক্টোবর ২০০২

শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে—এই মুহূর্তে

প্রথম আলো থেকে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সচল রাখার জন্য এই মুহূর্তে কী করা উচিত বলে আমি মনে করি সে সম্পর্কে কিছু লিখতে। এখানে 'এই মুহূর্তে' শব্দটির কারণে আমি একটু বিপাকে পড়ে গেছি। কেউ যদি একজন ভয়ানক রকম জ্বরাক্রান্ত রোগী নিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'এই মুহূর্তে' কী করা উচিত? আমি নিশ্চতভাবেই বলব, আপাতত মাথায় পানি দাও। কিন্তু মাথায় পানি দেওয়া তার চিকিৎসা নয়। তার চিকিৎসার জন্য রক্ত পরীক্ষা করতে হবে, সংক্রমণের কারণটি বের করতে হবে, ঠিক এন্টিবায়োটিক্সটি দিতে হবে, পথ্য ঠিক করে দিতে হবে, শুইয়ে রাখতে হবে এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এখানেও তাই। কেউ যেন মনে না করেন কয়েক শ শব্দের একটি লেখায় কেউ সব সমস্যার সমাধান বলে দেবে—এটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথায় পানি ঢালার ব্যাপারটুকু। এই দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা এখনো শুরু হয়নি, সত্যি কথা বলতে কী এখনো কেউ ডাক্তারের কাছেও যায়নি।

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মোটা দাগে দুইভাগে ভাগ করা যায়; পুরাতন এবং নতুন। পুরাতন এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যাগুলোও এক রকম নয়, কাজেই 'এই মুহূর্তের' প্রেসক্রিপশনও হবে দুই রকম। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সবচেয়ে বড় যে সমস্যা পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটি নেই, তাদের শিক্ষকের অভাব নেই। ঐতিহ্যবাহী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকারের ভালো শিক্ষক আছেন। তবে সে কারণে তাদের যে-কোনো সমস্যা হয় না তা নয়, বয়সের কারণে এক ধরনের জড়তা এসে যায়। কাজেই এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোনো একটা পরিবর্তন আনাও একটু কঠিন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেটা চট করে করে ফেলতে পারে, পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা করতে দীর্ঘদিন লেগে যায়।

তবে কেউ যদি আমাকে বলতে বলে 'এই মুহূর্তে' কোন সমস্যাটি সমাধান করা উচিত, তাহলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমি বলব শিক্ষক সমস্যা।

আমি যখন ঐতিহ্যবাহী বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংখ্যা শুনি তখন হিংসায় আমার চোখ ছোট ছোট হয়ে যায়। তাদের যতগুলো কোর্স দিতে হয়, অনেক বিভাগে শিক্ষকের সংখ্যা তার থেকে অনেক বেশি—সবাইকে সব বছর পড়াতেও হয় না! নতুন বিশ্ববিদ্যালগুলোর জন্য সেটি একটি অচিন্তনীয় ব্যাপার। আমার এই লেখার কথাবার্তায় তাই ঘুরে-ফিরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলোই উঠে আসবে, কারণ সেটাই অনেক বেশি গুরুতর।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনার ব্যাপারটি ছেলেখেলা নয়, তাই সেখানে শিক্ষক হওয়াটাও ছেলেখেলা হওয়া উচিত নয়। উন্নত দেশগুলোতে আজকাল পিএইচডি না করে কেউ শিক্ষক হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না। আমাদের দেশে চার বছরের একটা আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি শেষ করেই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে যোগ দেওয়া যায়। আমাদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে একজন মেধাবী ছাত্র সদ্য পাস করেই পড়ানো, পরীক্ষা নেওয়া, পরীক্ষার খাতা দেখা এমনকি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রভোস্ট বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করেছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমি তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি—আশান্বিত হয়েছি।

সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের দেশের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তরুণ শিক্ষকদের দেখে আমাদের মতো দরিদ্র দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনার একটি নতুন মডেল আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে আসছে। আমি ঠাট্টা করে এটাকে 'দুই ইঞ্চি' মডেল বলি। বড় বড় ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় যখন অভিজ্ঞ এবং প্রবীণ শিক্ষকদের দিয়ে কোর্স পড়াচ্ছেন, তখন আমরা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'বাচ্চা' শিক্ষকদের দিয়ে এই কোর্স পড়াচ্ছি। এই বাচ্চা শিক্ষকেরা মাত্র পাস করে বের হয়েছে, যারা এখনো পড়ছে সেই ছাত্রদের থেকে মাত্র 'দুই ইঞ্চি' বেশি জানে এবং তার ওপরে ভরসা করেই সেই পার্থক্যটুকু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ভরাট করার চেষ্টা করছে। আমাদের খুব বড় সৌভাগ্য যে, আজকাল খুব কম দামে চমৎকার সব টেক্সট বই পাওয়া যায়। বাচ্চা শিক্ষকেরা রাত জেগে সেই টেক্সট বই পড়ে লেকচার নোট রেডি করে ছাত্রদের পড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের পড়ানো ছাত্রছাত্রীরা পাস করে বের হয়ে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আনন্দের সঙ্গে আবিষ্কার করেছি, তারা সবাই তাদের নিজেদের কর্মক্ষেত্রে খুব চমৎকারভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছে। আমার ধারণা, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চালিয়ে নেওয়ার

জন্য আমাদের মতো দরিদ্র দেশে এই 'দুই ইঞ্চি' মডেলকে এখনো দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে হবে।

'দুই ইঞ্চি' সমাধান কিন্তু একটা সাময়িক সমাধান। কেউ যদি সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চায় তাকে তার জ্ঞানের পরিধি, গবেষণা এবং অভিজ্ঞতার পরিধি আরো অনেক বাড়াতে হয়। ছাত্র এবং শিক্ষকের জ্ঞানের পার্থক্যকে দুই ইঞ্চি থেকে বাড়িয়ে দুই গজ নয়, দুই মাইল করে ফেলতে হয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের দায়িত্বকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়: পড়ানো, গবেষণা করা এবং প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করা। এর যে-কোনো একটি করা না হলে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হয়, তা না হলে শিক্ষকের ক্ষতি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় তো একটি ট্রেনিং সেন্টার নয় যে কোর্সভিত্তিক কিছু পড়াশোনা করিয়ে বিদেয় করে দিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ছাত্রকে পুরোপুরি মানুষ হিসেবে গড়ে দিতে হবে। সেই কাজটি একজন করতে পারেন যখন তার ভেতরে জ্ঞানের একটি গভীরতা আসে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে তাদের তরুণ শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশে গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম এখনো ঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি—কাজেই বেশির ভাগ সময়েই এর জন্য দেশের বাইরে যেতে হয়। সরকারি স্কলারশিপের সংখ্যা খুব কম, এক সরকার যদি আলাদাভাবে কিছু স্কলারশিপের ব্যবস্থা করেন, পরের সরকার এসে সেটাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বন্ধ করে দেন। কাজেই নতুন শিক্ষকদের অনেক সময় নিজেদের উদ্যোগী হয়ে এই উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। আগে লেখালেখি করতে হতো, আজকাল ই-মেইল চালাচালি করতে হয়। শুধু ই-মেইল দিয়েই হয় না। নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয় TOEFL, GRE ধরনের পরীক্ষা দিতে হয়। কাজেই নিজেদের খাটাখাটুনি করে পড়াশোনার সীমাবদ্ধতাটুকু পুষিয়ে নিতে হয়। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বাইরে যাওয়ার একটি কালচার গড়ে উঠেছে, একজন গিয়ে অন্যজনকে উৎসাহ দিচ্ছে, সাহায্য করছে। কাজেই বেশ বড়সংখ্যক শিক্ষক বাইরে চলে যাচ্ছেন। পড়াশোনা শেষ করে তাদের ফিরে আসতে বেশ কয়েক বছর লেগে যায়, তাই মাঝখানে একটা সময় থাকে যখন শিক্ষকের অভাব হয়ে যায়। দেশকে আমরা যে অবস্থার মাঝে এনে হাজির করেছি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে নোংরামোর জন্ম দিয়েছি যে, যারা বাইরে যান তাদের অনেকে আর ফিরে আসতে সাহস পান না। ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা জটিল হয়ে যায়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমস্যাটি সবচেয়ে বেশি—শাঁখের করাতের মতো

নতুন বিশ্ববিদ্যালয়েই তরুণ শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনও সবচেয়ে বেশি .

এরকম যখন একটা অবস্থা হয় তখন সরকারকে একটু সাহায্য করতে হয়। কিন্তু দেশে কী হয়েছে কে জানে, ঠিক এরকম সময়ে সরকারের সাহায্যের ব্যাপারটুকু উঠে যেতে বসেছে। কারণটি কী জানা নেই, কিন্তু সবকিছু দেখে মনে হয় সরকার আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যেন একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে। একটা বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর জন্য যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন সে পরিমাণ টাকা দেওয়া হচ্ছে না। আমরা জানি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক-জাতীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের সরকারকে নানাভাবে চাপ দেয়, সরকারও তাদের খুশি রাখার জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকে (আদমজী জুট মিলের কথা মনে আছে?)। মনে হয়, তারা সরকারকে বুঝিয়েছে এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লোকসানি ব্যাপার, এগুলো বন্ধ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা যাক। যার প্রয়োজন সে পয়সা দিয়ে শিক্ষা কিনে নেবে। রাতারাতি অসংখ্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রক্ষা করার জন্য কোনো ধরনের সাহায্য নিয়ে কেউ এগিয়ে এল না। শুধু তা-ই নয়, আগের সরকার যে ছয়টা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেছিল বেশ নির্দয়ভাবে সেগুলোও বন্ধ করে দিল। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো না থাকলে মধ্যবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের ছেলে মেয়েরা কোথায় পড়বে? পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব দরকার, সেটি বন্ধ করে দিয়ে এই সরকার একটি অত্যন্ত অন্যায়, অমানবিক এবং স্বার্থপরের মতো কাজ করেছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চালাতে সরকারকে টাকা দিতে হয়। মনে হচ্ছে সরকার এই অবস্থাটির পরিবর্তন করতে চাইছে। তাদের ইচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজের পায়ে দাঁড়াক, কিন্তু তার জন্য যে সময়টি বেছে নিয়েছে সেটি ঠিক নয়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখনই শিক্ষক, ল্যাবরেটরি, হল, অবকাঠামো এসবের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করি, সবসময়ই বলা হয়, টাকা নেই। শুধু যে নেই তা নয়, আসবে সে রকম সম্ভাবনাও নেই। সবার মুখে মুখে যে শব্দটি সেটি হচ্ছে 'বাজেট কাট'। একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরোপুরি দাঁড় করিয়ে তাকে নিজের শক্তিতে চলার সুযোগ করে দেওয়া যায়, মাঝপথে তাকে পরিত্যাগ করে দিলে কেমন করে চলবে? নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর আগের বছর থেকে বেশি কৃচ্ছ্র সাধন করতে

হয়। এ প্রসঙ্গে আমার নাসিরুদ্দিন হোজ্জার সেই গাধার গল্পটি মনে পড়ে যায়: নাসিরুদ্দিন হোজ্জা বেচারা অর্থকষ্টে পড়েছে বলে ঠিক করল গাধার খাবার থেকে কিছু পয়সা বাঁচাবে। একদিনে খাবার কমিয়ে দিলে গাধার অসুবিধে হবে বলে সে ধীরে ধীরে গাধার খাবার কমাতে আরম্ভ করল। কমাতে কমাতে এক সময় সে একেবারেই খাবার বন্ধ করে দিল। দু'দিন পরে নাসিরুদ্দিন হোজ্জা ঘুম থেকে উঠে দেখে তার গাধা চার পা ওপরে তুলে মরে পড়ে আছে। হোজ্জা তখন মাথা চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার মতো দুর্ভাগ্য আর কার হতে পারে? খাবার না খেয়ে বেঁচে থাকাটা যখন গাধাকে অভ্যাস করিয়ে ফেললাম, ঠিক তখন গাধাটা মরে গেল।'

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, সরকারের ঠিক এই অবস্থা হবে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টাকা কমাতে কমাতে যখন সেটা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন সরকার মাথা চাপড়ে বলবে, 'যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো টাকা ছাড়াই চলতে শুরু করেছিল তখন সেটা ধ্বংস হয়ে গেল!'

আমি নিশ্চিত অনেকেই ভাবছেন আমার এই ক্ষোভটিতে অনেক অতিরঞ্জন আছে, আমি বাড়িয়ে-চাড়িয়ে বলছি, সরকারকে খাটো করার চেষ্টা করছি! আমি একটা উদাহরণ দিই। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ।

এর আগের সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জ্যাম কমানোর জন্য একটা সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হলো। আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর সরকারের উচ্চ পর্যায়ের মানুষজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসে আমাদের জানালেন, সবাই মিলে ঠিক করেছে যে সদ্য ইন্টারমিডিয়েট পাস করা ব্যাচকে বসিয়ে রাখা যাবে না, এখনই তাদের ভর্তি করিয়ে ক্লাস শুরু করে দিতে হবে। এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া খুব সহজ কিন্তু সেগুলো আসলে করতে হয় শিক্ষকদের। তাই ভাইস চ্যান্সেলর যখন সব বিভাগীয় প্রধানদের ডেকে এই প্রস্তাবটি দিলেন শিক্ষকরা আক্ষরিক অর্থে একেবারে হৈচৈ করে উঠলেন। তারা সবাই একসঙ্গে বললেন, অনেক কষ্ট করে হয়তো ক্লাসরুম, চেয়ার-টেবিল ম্যানেজ করা যাবে কিন্তু নতুন শিক্ষক নেওয়া না হলে এটি অসম্ভব একটি ব্যাপার। সকল শিক্ষকের সুপারিশে তখন সরকারি উদ্যোগকে সম্মান দেখানোর জন্য একসঙ্গে বেশ কয়েকজন শিক্ষক নেওয়া হলো, তাদের সাহায্যে নতুন বাড়তি ব্যাচ নিয়ে বিশ্বাবিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হলো।

সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে কীভাবে জানি রটে গেল, এই শিক্ষকদের নিয়োগ রাজনৈতিক নিয়োগ। হঠাৎ করে আমরা খবর পেলাম এই

শিক্ষকদের বেতন বন্ধ হয়ে যাবে। পত্রপত্রিকায় বড় বড় করে সেই খবর বের হলো, একেবারে একশ ভাগ নিয়ম মেনে নিয়োগ দেওয়া সেই সব মেধাবী তরুণ-শিক্ষকদের মাথায় হাত, তাদের বাবা-মায়েরা ফোন করতে লাগলেন, দুই-একজনের বিয়ের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। কীভাবে কীভাবে জানি হিসাব করে বেতন বন্ধ হওয়ার খাতায় ৬৩ জন শিক্ষকের নাম উঠে গেল এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এই সম্পূর্ণ নিরপরাধ ৬৩ জন তরুণ এক ধরনের অবমাননা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হলেন। সরকার থেকে তাদের বেতন দেওয়া যাবে না—কথাটি বেশ শক্ত ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই ৬৩ জন শিক্ষকের বেতন বন্ধ করে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দালান-কোঠা, ঘরবাড়ি, চেয়ার-টেবিল, ল্যাবরেটরি, ইলেক্ট্রিসিটি, টেলিফোন এবং গ্যাস সাপ্লাই থাকবে কিন্তু ছাত্রদের পড়ানোর জন্য কোনো শিক্ষক থাকবে না, এই একেবারে সহজ সত্য কথাটি কেউ শুনতে রাজি হলো না! একজন তরুণ শিক্ষকের বেতন মাত্র ৬ হাজার টাকা (বড়লোকদের বাসায় ড্রাইভারেরা এর থেকে বেশি বেতন পায়), মাত্র এই অল্প কিছু টাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে দেশের সবচেয়ে প্রতিভাবান তরুণদের এই হেনস্তা যেন বানের জলে ভেসে এসেছে, তাদের যেন কেউ দয়া করে খেতে-পরতে দিচ্ছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ছয়টি ব্যাচ। প্রত্যেকটি বিভাগই প্রতি ব্যাচে ৫০ থেকে ৬০ জন ছাত্রছাত্রী (একটি বিভাগে দুই সেকশনে দ্বিগুণ), তাদের থিওরি ক্লাস নিতে হয়, ল্যাবরেটরি ক্লাস নিতে হয়, পরীক্ষা নিতে হয় এবং খাতা দেখে সেই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে ছয়টি ব্যাচকে পড়ানোর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র পাঁচজন। আমি জানি, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কথাটি সত্য। সেই পাঁচজন শিক্ষক কীভাবে ছয় ব্যাচের ছাত্রছাত্রীকে পড়িয়ে যাচ্ছেন আমি জানি না, তাদের জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, কেমন করে এরকম একটা পরিস্থিতির জন্ম হলো। এত কম শিক্ষক নিয়ে কেমন করে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ কাজ শুরু করার সাহস পেল। সবার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছিল। সরকারের এক বছরপূর্তি হওয়া নিয়ে অনেক আনন্দ-স্ফূর্তি করা হয়েছে কিন্তু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এক বছর কোনো শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। খোঁজ নিয়ে আমরা জানতে

পেরেছি, আমরা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অনুমতি পাইনি। কাজেই, যখন শিক্ষক নেওয়ার কথা ছিল তখন শিক্ষক নেওয়া যায়নি, যারা ছিল তাদের অনেকে চলে গেছে এবং সেই অভাব কিছুতেই পূরণ করা যাচ্ছে না। আমরা এই অবিশ্বাস্য দৃশ্যটি বিস্ফারিত চোখে দেখছি, কেউ কিছু করতে পারছি না, হতাশায় মাথা কুটতে ইচ্ছে করে। অবস্থা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটা ডুবন্ত জাহাজ মনে করে যে যেখানে পারে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে! এটি ক্ষোভের কথা নয়, এটি বাস্তবতা।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে শিক্ষকদের দায়িত্বের একটি গাইডলাইন দেখেছিলাম। সেখানে একজন শিক্ষক সপ্তাহে কত ঘণ্টা কাজ করবেন তার একটা তালিকা দেওয়া ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যদি হঠাৎ একদিন ঘোষণা করে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তাদের কাছে যত ঘণ্টা শ্রম আশা করে তারা তার থেকে বেশি কাজ করবেন না, তা হলে রাতারাতি এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের দেশের মানুষেরা কাজ করতে চায় না, তারা অলস এবং ফাঁকিবাজ—এই ধরনের অপবাদ দিয়ে এবং শুনে যারা অভ্যস্ত তারা যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তা হলে নিশ্চিতভাবেই হতবাক হয়ে যাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সচল রাখার জন্য এখানকার তরুণ শিক্ষকেরা কী পরিমাণ পরিশ্রম করে সেটি নিজের চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদগুলোর অন্যতম। এই সম্পদের সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে এই শিক্ষকেরা, সম্পদটুকু অর্থবহ করে তোলে এর ছাত্রছাত্রীরা। আমরা যদি সেই শিক্ষকদের নির্বাসন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে চাই, সেটি আর যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে না! যখন দেশের ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবকেরা খবর পাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পড়ানোর জন্য শিক্ষক নেই তখন কোন ভরসায় এখানে পড়তে আসবে শিক্ষার্থীরা? আর যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বাস নেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঁচে থাকার অর্থ কী?

এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে কী করা উচিত সেটি লিখতে বসেছিলাম। আমার মনে হয়, সেটি নিয়ে কারো ভেতরে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। যে কোনো মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোকে বাঁচাতে হবে—সে জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের।

সেই শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই মুহূর্তে।

দৈনিক প্রথম আলো, ১৮/১১/০২

দুঃস্বপ্নের রাত এবং দুর্ভাবনার দিন

জাহিদ মোটরসাইকেল স্টার্ট করে তার স্ত্রী শায়লাকে ডেকে বলল, 'উঠে এসো।'

শায়লা এসে জাহিদের পেছনে বসে হাত দিয়ে জাহিদকে শক্ত করে ধরতেই জাহিদ মোটরসাইকেলটা ছেড়ে দেয়। জাহিদ আর শায়লা মধ্যবিত্ত মানুষ, অনেক কষ্ট করে মোটরসাইকেলটা কিনেছে, তবে কেনার পর তাদের খুব সুবিধে হয়েছে। খুব অল্প খরচে যে-কোনো জায়গায় চলে যেতে পারে, খারাপ ধরনের ট্রাফিক জ্যাম হলেও ফাঁকফোকর দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে।

জাহিদ একটা টেম্পোকে পাশ কাটিয়ে বলল, 'লিস্টিটা এনেছো?'

শায়লা বলল, 'লিস্টি আবার কী? মায়ের জন্য একটা শাড়ি, রাজু আর মিলির জন্য কাপড়, তোমার জন্য একটা পাঞ্জাবি।'

জাহিদ বলল, 'না, না আমার জন্য পাঞ্জাবি লাগবে না।'

'ঈদের মধ্যে একটা নতুন কাপড় পরবে না?'

'বড় মানুষের আবার ঈদ কীসের? জিনিসপত্রের যা দাম, টাকা-পয়সা নষ্ট করো না। তার চেয়ে বরং বড় খালাকে একটা শাড়ি দাও—খুব কষ্টে আছে।'

শায়লা বলল, 'কাকে কী দিতে হবে সেটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

জাহিদ একটা জটলার ভেতর দিয়ে মোটরসাইকেলটা বের করে এনে বলল, 'সেটা তো অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি। তুমি কী আমার কোনো কথা শোনো?'

মার্কেটের কাছাকাছি এসে শায়লা বলল, 'রাজু আর মিলিকে নিয়ে এলে হতো। ঈদের বাজার সবাইকে নিয়ে করতে হয়।'

জাহিদ বলল, 'ঠিকই বলেছো। যখন ছোট ছিল তখন সবাইকে এই মোটরসাইকেলে বসিয়ে নিয়ে যেতাম মনে আছে?'

'মনে আছে। সামনের শুক্রবারে সবাইকে নিয়ে আসব'—শায়লা তার কথা শেষ করতে পারল না, হঠাৎ করে ব্রেক কষে জাহিদ মোটরসাইকেল থামিয়েছে। শায়লা উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'কী হয়েছে?'

'থামতে বলছে।'

'কে থামতে বলেছে?'

'মিলিটারি।'

শায়লা এক ধরনের অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। দুজন মিলিটারি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তাদের পোশাক ফিটফাট, হাতে চকচকে অস্ত্র এবং চোখে-মুখে এক ধরনের কঠিন ভাব। মিলিটারি দুজন আলগোছে অস্ত্রটা ধরে রেখে কিছুক্ষণ দুজনকে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করল, তারপর তুলনামূলকভাবে কমবয়সী মিলিটারিটি জাহিদকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পেছনের মহিলাটি কে?'

জাহিদ থতমত খেয়ে বলল, 'আমার ওয়াইফ।'

'ওয়াইফ না গার্লফ্রেন্ড?'

সূক্ষ্ম একটা অপমানে জাহিদের মুখ লাল হয়ে যায়। সামনের মানুষটি একজন সশস্ত্র মিলিটারি না হলে নিশ্চয়ই এই ধরনের বাজে কথা বলার জন্য সে প্রতিবাদ করে কিছু বলত। কিন্তু এখন সে অপমানটি হজম করে নিচু গলায় বলল, 'না, ওয়াইফ।'

'প্রমাণ আছে?'

জাহিদ অবাক হয়ে বলল, 'প্রমাণ?'

মিলিটারিটি বলল, 'মোটরসাইকেল থেকে নামেন।'

হঠাৎ জাহিদ কেমন জানি ভয় পেয়ে যায়। শায়লা ফিস ফিস করে বলল, 'আমাদের নামতে বলছে কেনগো?'

'জানি না।'

জাহিদ মোটরসাইলেটা এক পাশে দাঁড়া করিয়ে সেখান থেকে নেমে আসে। শায়লা বিবর্ণ মুখে জাহিদের পেছনে এসে দাঁড়াল। শায়লা মাথা ঘুরিয়ে দেখে খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে বেশকিছু মানুষ কৌতূহলী চোখে তাদের দেখছে।

কঠোর চেহারার মিলিটারিটি জাহিদকে জিজ্ঞেস করল, 'মোটরসাইকেলের কাগজপত্র ঠিক আছে?'

'আছে।'

'দেখি।'

জাহিদ তার কাগজপত্র দেখালো, মিলিটারি মানুষটি কাগজপত্র দেখে তাকে ফেরত দিয়ে বলল, 'আপনার হেলমেট কই?'

'হেলমেট?' জাহিদকে হঠাৎ কেমন জানি বিপন্ন দেখায়।

'হ্যাঁ, আপনি জানেন না হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল চালানো বেআইনি? কোথায় হেলমেট?'

জাহিদ আমতা আমতা করে বলল, 'বাসায় রেখে এসেছি।'

'কেন বাসায় রেখে এসেছেন?'

'ভুল করে।'

'বউকে তো ভুল করে বাসায় রেখে আসেননি! এসেছেন?'

জাহিদ কী বলবে বুঝতে পারল না, লজ্জায় তার মাথা নিচু হয়ে এল।

'কান ধরেন।'

জাহিদ চমকে উঠল। মিলিটারিটি কী বলছে সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। সে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মিলিটারির দিকে তাকালো। কমবয়সী কঠোর চেহারার মানুষটি অস্ত্র হাতবদল করে ধমক দিয়ে বলল, 'ধরেন কান, একজন আরেকজনের।'

জাহিদ শায়লার দিকে তাকালো, রক্তহীন ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে সে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মিলিটারিটি হাতের অস্ত্র উদ্যত করে ধমক দিয়ে বলল, 'কী হলো? কথা কানে যায় না? ধরেন কান একজন আরেকজনের।'

জাহিদ মাথা নাড়ল, নিচু গলায় বলল, 'কী বলছেন আপনি?'

মিলিটারিটি হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'ধরেন বলছি। ধরেন।'

জাহিদের শরীর শক্ত হয়ে যায়, সে কাঁপা গলায় বলল, 'না—'

শায়লা মিলিটারির চোখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠে, সে জাহিদের হাত ধরে ফিস ফিস করে বলল, 'কোনো পাগলামি করো না। প্লিজ প্লিজ—'

জাহিদ ভাঙা গলায় বলল, 'না—'

শায়লা কাতর গলায় বলল, 'প্লিজ!'

রাস্তার মোড়ে কয়েকজন মিলিটারিকে ঘিরে বেশ কয়জন কৌতূহল মানুষ দাঁড়িয়েছিল, তারা দেখতে পেল একজন ভদ্রলোক এবং তার কম বয়সী ফুটফুটে স্ত্রী একজন আরেকজনের কান ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। রাস্তাঘাটে হঠাৎ করে যখন কোনো অপ্রকৃতিস্থ মানুষ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের দেখে সবাই যে রকম চোখ সরিয়ে নেয়, এই দৃশ্যটি দেখেও সবাই সে রকম চোখ সরিয়ে নিল।

২.

ওপরের ঘটনাটি একটি সত্যি গল্প। চরিত্রগুলোর নাম, নিজেদের ভেতরকার কথাবার্তা আমি বসিয়েছি, বাকিটুকু পুরোপুরি সত্যি। এটি সিলেট শহরে মাসখানেক আগে ঘটেছিল এবং একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে জানিয়েছেন। আমার ধারণা সারা দেশে এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটছে। মিলিটারির হাতে গড়ে প্রতিদিন একজন করে মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে বলে মানুষের সম্মান এবং সম্ভ্রম খুন হওয়া এই বিষয়গুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে, কেউ এ নিয়ে কথা বলছে না। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এটি ১৯৭১ নয় এবং একটি স্বাধীন দেশে একজন মানুষের সম্ভ্রমের মূল্য তার প্রাণের মূল্য থেকে একবিন্দু কম নয়।

এই দেশে আজকাল কোনো কিছুই স্বচ্ছ নয়, সবকিছুই কেমন জানি আবছা এবং ঘোলাটে, তারপরেও আমরা জানি দেশে মিলিটারি নামানো হয়েছে সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, অন্য কিছু নয় শুধু সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের বাইরে যদি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও ঘটে সে জন্য মিলিটারিকে দায়ী থাকতে হবে। একজন মানুষের সম্ভ্রম এবং সম্মান, তার অধিকার নষ্ট করা হলে কিংবা এই দেশের কোনো মানুষকে খুন করা হলে এই দেশের আইনে তার বিচার করতে হবে। যদি বিচার করা না হয় সেটি হবে অন্যায়। অত্যন্ত বড় একটি অন্যায়।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি মিলিটারিকে দেখলে এই দেশের একজন মানুষ এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক এবং বুকের ভেতর এক তীব্র ঘৃণা অনুভব করত। এখন স্বাধীন দেশে একজন মিলিটারিকে দেখে আমাদের নিজেদের ভেতর গভীর নিরাপত্তার বোধ জন্ম নেওয়ার কথা, তাদের জন্য বুকের ভেতর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ জন্মানোর কথা—সেটি যদি না হয়ে থাকে বুঝতে হবে কোথাও কিছু একটি গোলমাল হয়েছে। সেটি যদি ইচ্ছে করে করানো হয়ে থাকে বুঝতে হবে গোলমালটি খুব গুরুতর।

মিলিটারির সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু আমি খুব অবাক হয়েছিলাম যখন আমাদের পরিবারের নতুন প্রজন্মের একজন সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য ইন্টারভিউ দিতে গেলে তাকে বলা হলো, 'তোমাদের পরিবারে তো ইনটেলেকচুয়াল আছে, তারা তো তোমাকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে দেবে না!' (লেখালেখি করার অপরাধে আমি এবং আমার অগ্রজ হুমায়ূন আহমেদকে এই ইনটেলেকচুয়াল গোত্রে ফেলে মন্তব্যটি করা হয়েছিল)। কথাটি হয়তো হালকা কথা—ঠাট্টাচ্ছলে কৌতুক করে বলা হয়েছিল, তবুও আমি শুনে একটু বিচলিত হয়েছিলাম, সেনাবাহিনীর সদস্যরা কি দেশের বুদ্ধিজীবীদের তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করেন? কেন করেন?

আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখি না। আমার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ খুব কম, কিন্তু যখন যোগাযোগ হয়েছে আমি সেটা উপভোগ করেছি। মাঝে মাঝেই সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসারদের সামনে বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি এসব ব্যাপার নিয়ে আমাকে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং আমি সাগ্রহে প্রত্যেকবার তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। তাদের সামনে বক্তব্য রেখেছি, বক্তব্য শেষে তাদের আলোচনায় অংশ নিয়েছি, প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি (আমার সঙ্গে সবচেয়ে প্রাণবন্ত বিতর্ক হয়েছিল বিজ্ঞান এবং ধর্মের মাঝে সম্পর্কের ব্যাপারটুকু নিয়ে)। ১৯৯৮ সালে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এসেছিলেন, তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি বিশাল

এসএসএফ বাহিনীর অফিসাররা এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। আমি সেই তরুণ অফিসারদের সহায়তা করেছিলাম, তাদের কঠোর শৃঙ্খলা, নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা, কাজের ধরন (আমার কাছে খানিকটা বাড়াবাড়ি মনে হলেও) দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে হেলিকপ্টারটি আকাশে উঠে যাওয়ার পর সেই তরুণ অফিসাররা প্রথমবার একটু সহজভাবে নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন এবং তাদের একজন বিনয় সহকারে আমাকে বলেছিলেন, 'স্যার, আমার স্ত্রী আপনার লেখার খুব ভক্ত। আপনি যদি একটা অটোগ্রাফ দিতেন—'

আমি সকৌতুকে আবিষ্কার করেছিলাম সুঠাম, দৃপ্ত, তেজস্বী এই তরুণ অফিসারদের আপাত কঠিন একটি বাহ্যিক পরিচয়ের ভেতরে ছোট একটি কিশোরের মন লুকিয়ে আছে। আমি তাদের সবাইকে আমার বাসায় নিয়ে নিজের লেখা বই অটোগ্রাফ করে তাদের উপহার দিয়েছিলাম।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমাদের বিমান বাহিনীর মিগ বিমানগুলো নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আমি এর খুঁটিনাটির ভেতরে কতটুকু খাঁটি, কতটুকু রাজনৈতিক জানি না। কিন্তু যতবার আকাশে শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমানগুলোকে শব্দের বাধা অতিক্রম করে উড়ে যেতে দেখেছি ততবার ককপিটে এই দেশের একজন তরুণ বৈমানিক বসে আছে ভেবে আবেগে উদ্বেলিত হয়েছি। কিছুদিন আগে একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টেলিফোন করে তাদের একটি টেকনিক্যাল ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারব কি না জানতে চেয়েছিলেন। সমস্যার খুঁটিনাটি না জেনেই আমি সাগ্রহে রাজি হয়েছিলাম, সমস্যাটি সমাধান করার জন্য যাদের সাহায্য নিয়ে একটি টিম দাঁড়া করানোর প্রয়োজন হতে পারে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলে একটি টিম প্রস্তুত করে রেখেছিলাম।

দেশের বড় বড় অর্থনীতিবিদরা সামরিক বাহিনীকে অনুৎপাদনশীল খাত বলে ভর্ৎসনা করেন, তার কারণ আমি জানি এবং গুরুত্বটি অনুভব করি, তার পরেও প্রতিবছর ১৬ ডিসেম্বর প্যারেড গ্রাউন্ডে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্যারেড দেখে আমি এক ধরনের ছেলেমানুষী আনন্দ পাই! (গত বছর প্রথমবার আমি টেলিভিশন বন্ধ রেখেছিলাম। এই প্রথম আমাদের মন্ত্রিসভায় নিজামী-মুজাহিদীর মতো মানুষ রয়েছেন—যারা শুধু যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছেন তাই নয়, সেই সময়ে আমাদের দেশের সোনার সন্তানদের হত্যায় নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারা মঞ্চে বসে থেকে আমাদের দেশের সশস্ত্রবাহিনীর সালাম গ্রহণ করবেন সেই দৃশ্য আমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়)।

কাজেই আমি জানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু

সেনাবাহিনীর কি আমার (বা আমাদের) সঙ্গে কোনো বিরোধ আছে? আমার মনে হয় আছে, কারণটা বলি।

হরতালের দিন বলে সেদিন রাস্তাঘাটে গাড়ি-স্কুটার নেই। আমি হেঁটে হেঁটে আসছি, শর্টকাট মারার জন্য এয়ারপোর্ট রোড থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছি। গেটে একজন মিলিটারি পুলিশ আমাকে থামাল। এই গেট দিয়ে অনেক মানুষ, গাড়ি-স্কুটার যাতায়াত করে। আমি একটু অবাক হয়ে দাঁড়ালাম। মিলিটারি পুলিশ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

আমি গন্তব্য স্থানটুকু জানালাম। মিলিটারি পুলিশ এবারে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পরিচয়?'

আমি বললাম যে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। মিলিটারি পুলিশ আমাকে তখন হাত নেড়ে যেতে অনুমতি দিল। আমি রওনা দিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, আশপাশ দিয়ে আরো মানুষ হেঁটে যাচ্ছে, হরতাল হলেও বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটি গাড়ি-স্কুটারও যাচ্ছে, তাদের কাউকে না থামিয়ে আমাকে থামাল কেন?

আমি মিলিটারি পুলিশকে সেই প্রশ্নটি করলাম, 'আচ্ছা এই যে চারদিকে এত মানুষ যাচ্ছে আপনি তাদের কাউকে থামালেন না, আমাকে কেন থামালেন?'

মিলিটারি পুলিশ বলল, 'আমাদের যাকে সন্দেহ হয়, আমারা তাকে থামাই।'

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'আমাকে দেখে আপনার সন্দেহ হয়েছে?'

মিলিটারি পুলিশ মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, সন্দেহ হয়েছে।'

আমি অনেক জায়গায় এই গল্পটি করেছি এবং সবাই শুনে হেসে গড়াগড়ি খেয়েছে। গল্পটিতে হাস্যরসের পাশাপাশি একটি ভয়ের দিক রয়েছে। মিলিটারি একাডেমিতে আমি যখন আমন্ত্রিত হয়ে যাই তখন আমি সেখানে একজন 'সম্মানিত শিক্ষক' কিন্তু যখন আমি নিজে থেকে ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করার চেষ্টা করি তখন আমি (আমার চেহারার কারণে) একজন 'সন্দেহভাজন ব্যক্তি!' যেহেতু আমি সন্দেহভাজন ব্যক্তির চেহারা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি আমার পক্ষে নিরাপদ ব্যাপার হবে শর্টকাট মারার জন্য ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ না করা। কিন্তু যখন দেশে মিলিটারি নামানো হয়, তখন আমরা কী করব? আমি নিজে থেকে মিলিটারির সঙ্গে ঝামেলায় পড়তে যাই না। কিন্তু রাস্তাঘাটে কোনো এক জায়গায় মিলিটারি পুলিশের মতো কোনো একজনের যদি হঠাৎ করে আমাকে সন্দেহভাজন

মনে হয়ে যায়, তখন কী হবে? আমি সম্ভবত গলার রগ ফুলিয়ে তর্ক করে সমস্যাটি আরো বাড়ানোর চেষ্টা করব না, কিন্তু যদি নীতিবাগীশ কোনো তেজস্বী মানুষ তার সাংবিধানিক অধিকারের কথা মনে রেখে প্রতিবাদ করতে শুরু করেন, তখন? তাকে যদি খুন করে ফেলা হয় তখন? দিনে একজন করে মানুষ তো খুন হচ্ছে—আজকে সেই একজন কে হবে? আগামীকাল এই রাশিয়ান রুলেট খেলায় খেলোয়াড় কারা?

৩.

এরশাদের সামরিক শাসনের সময় আমি একবার দেশে এসে বেশ অবাক হয়ে গেলাম—ঢাকা শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটা নতুন সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে, আত্মীয়স্বজনের ভেতরে কতজন এবং কত বড় মিলিটারি অফিসার আছে সেটা দিয়ে একটি পরিবার কত বড় এলিট, সেটি বিবেচনা করা হয়। দৈনন্দিন কাজে সেই বড় মিলিটারি অফিসারদের সাহায্য নেওয়া হয়। এলিট পরিবারের কোনো সমস্যা হয় না, মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে সম্পর্কহীন সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের সীমা নেই।

তখন একদিন একজন মেজরের সঙ্গে কথা হচ্ছে, তিনি কথা প্রসঙ্গে জানালেন তার পরিচিত এক আত্মীয়ের চিকিৎসায় একজন ডাক্তার গাফিলতি করেছে বলে তিনি সেই ডাক্তারকে তুলে এনে শাস্তি হিসেবে রৌদ্রের মাঝে হাঁটু গেড়ে সারা দিন দাঁড়া করিয়ে রেখেছিলেন। তার ভাষায়, ডাক্তার 'জন্মের মতো সিধে' হয়ে গেছে। আমি এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে সেই মেজরের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, এটি যে একটি ভয়ঙ্কর ধরনের অন্যায় তিনি সেটা জানেন না। সামরিক শাসনের কারণে তার ধারণা হয়েছে তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন এবং সত্যি সত্যিই তিনি যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছেন। আজকাল আমরা 'গালকাটা বক্কর' বা 'নাক বোচা জব্বর' এই ধরনের যেসব সন্ত্রাসীর নাম শুনি তার সঙ্গে এই মেজরের একেবারে কোনো পার্থক্য নেই।

(ঘটনাটি আমাকে খুব বিচলিত করেছিল এবং আমি এটার ওপর ভিত্তি করে একটা উপন্যাস লিখেছিলাম। উপন্যাসটির মাঝে কিছু নাটকীয় উপাদান আছে বলে অনেকে নাটক হিসেবে প্রযোজনা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই পিছিয়ে গেছেন, কারণ আমাদের দেশে প্রচারযন্ত্রে কখনোই সশস্ত্র বাহিনীর কাউকে খারাপ মানুষ হিসেবে দেখানোর নিয়ম নেই)।

দেশে সামরিক শাসন চলতে থাকলে এই ধরনের অন্যায় ব্যাপারগুলো ঘটতে থাকে। তখন খবরের কাগজের মুখ বন্ধ করে রাখা হয় বলে ব্যাপারটি সহজ হয়। এখন সামরিক শাসন নেই। কিন্তু দেশে মিলিটারি নেমেছে—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, যতদিন প্রয়োজন মিলিটারি থাকবে। শুধু তাই

নয়, খবরের কাগজের ওপর চাপ দেওয়ার একটা সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আমরা কী আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুর্ভাবনা শুরু করে দেব?

৪.

সাধারণ মানুষ খুব বেশি দূরের জিনিস ভাবতে চায় না, কাছাকাছি সমাধানটাই তাদের কাছে জরুরি। মিলিটারি নামার পর ছিঁচকে সন্ত্রাসী, ফালতু চাঁদাবাজ এবং গা জ্বালানো বখাটেদের উৎপাত বেশ কমেছে এবং সাধারণ মানুষ স্বস্তি নামক একটি সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তবে স্বস্তি নামক এই অনুভূতিটি কতদিন থাকবে সেটি নিয়ে সবার মধ্যেই এক ধরনের দুর্ভাবনা। ইদানীং সবার ভেতরেই একটি প্রশ্ন, মিলিটারি একদিন ব্যারাকে ফিরে যাবে (আশা করি) তখন দেশের সন্ত্রাসীরা কী করবে? কলকাতায় রোগী নিয়ে গিয়েছিলেন সেরকম একজন ফিরে এসে জানিয়েছেন, সেখানকার হোটেলে কোনো জায়গা নেই, দেশের সব সন্ত্রাসী হাওয়া বদল করতে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছে। যারা কলকাতা যায়নি তাদের বড় অংশ দেশে গা-ঢাকা দিয়ে আছে, আমাদের দেশে গা-ঢাকা দেওয়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। (এই সরকারের মন্ত্রিসভায় অনেকে আজকে মন্ত্রী হতে পেরেছেন, কারণ একাত্তর সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গা-ঢাকা দিয়েছিলেন)। মিলিটারিরা ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার পর দেশের যাবতীয় সন্ত্রাসীরা কি তাদের সব সন্ত্রাসী কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে একেবারে নিপাট ভালো মানুষ হয়ে যাবে? দেশের সব বেআইনি অস্ত্র কি উদ্ধার হবে? নতুন করে বেআইনি অস্ত্র আনা কি বন্ধ হবে? যারা ধরা পড়েছে তাদের কি বিচার হবে নাকি কয়েক দিন পর ছাড়া পেয়ে যাবে? তাদের একটা বড় অংশ বিএনপির রাজনীতির সমর্থক। প্রথম আলোতে এক সাক্ষাৎকারে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী তাদেরকে নিশ্চিন্ত করার জন্য এর মাঝে বলে দিয়েছেন যাদের বিরুদ্ধে মামলা নেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে (সন্ত্রাসী হলেই তার বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে সেটা কোথায় লেখা আছে?)। যে দেশে কলমের খোচায় কয়েক হাজার মামলা বাতিল করে দেওয়া যায় সেই দেশে কলমে কালি থাকলে ভয়ের কী আছে?

কাজেই ধরে নেওয়া যায় মিলিটারিরা যখন এক রাস্তা দিয়ে তাদের ব্যারাকে ফিরে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য রাস্তা দিয়ে পিলপিল করে সন্ত্রাসীরা তাদের জায়গা দখল করতে থাকবে। যারা এতদিন সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নালিশ করেছে, চাঁদা দিতে অস্বীকার করেছে তাদের কপালে

নিশ্চয়ই দুঃখ আছে। মিলিটারি চলে যাওয়ার পরে যখন সেই সন্ত্রাসীরা পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে গডফাদারদের আশীর্বাদ নিয়ে এবং রাজনৈতিক নেতাদের ভালোবাসা নিয়ে আবার হাজির হবে তখন নিশ্চয়ই সুদে-আসলে তাদের পুরো পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে। আমি কি কোনো কিছু বুঝতে ভুল করছি? কোন জিনিসটি এবারে অন্য রকম? মিলিটারিরা কি কোনো পরশ পাথরের খোঁজ পেয়েছেন যেটি দিয়ে সন্ত্রাসীদের স্পর্শ করলে তারা (হার্ট অ্যাটাকে মারা না গেলে!) সোনা হয়ে যাবে?

সন্ত্রাসকে সত্যিকার অর্থে দূর করতে হলে তার গোড়াতে হাত দিতে হবে—কিন্তু আমরা সবাই জানি কেউ সেই গোড়ায় হাত দেবে না। আবর্জনার পাশে বসে মাছি মেরে মাছি কমানো যায় না, আবর্জনাটুকু দূর করলে এমনিতেই মাছি কমে যায়। আমাদের দেশের সন্ত্রাসের গোড়াটুকু হচ্ছে রাজনৈতিক, কাজেই রাজনীতিকে পরিষ্কার না করে সন্ত্রাসকে কেমন করে পরিষ্কার করা হবে? মিলিটারি ব্যারাকে ফেরত যাওয়ার পর আমরা যদি যাবার সেই আগের অবস্থাতেই ফেরত যাই, তাহলে সেনাবাহিনীকে একটা বিশাল দুর্নামের ভাগী করে কার লাভ হবে?

৫.

সেদিন ট্রেনে করে যাচ্ছি হঠাৎ একজনকে বলতে শুনলাম, 'বুঝলেন না, গ্যাস রপ্তানি করতে হবে তো, সেই জন্য মিলিটারি। দেখবেন গ্যাস রপ্তানি চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই মিলিটারি নড়বে না।' এটা কি অনেক চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণা করে বলা কথা, নাকি একটা হালকা মন্তব্য আমি জানি না। তবে আমি কথাটি শুনে চমকে উঠেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত ভয়ানক একটি দেশ, বিশেষ করে আমাদের দরিদ্র দেশের জন্য— যেখানে খুব অল্প টাকায় অনেক বড় মানুষকে কিনে নেওয়া যায়।

দেশকে ভালোবাসেন সেরকম কি কেউ নেই যিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন কিন্তু তাকে কোনোভাবে টাকা দিয়ে কেনা যাবে না? বুক আগলে যিনি এই দেশকে রক্ষা করার জন্য, দেশের সম্পদকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসবেন?

দৈনিক প্রথম আলো, ৩০/১১/০২

এটি কোন বাংলাদেশ?

১.

গত বছর প্রথম আলোর বিজয় দিবস সংখ্যায় আমি একটা লেখা লিখেছিলাম; তার শিরোনাম ছিল 'অন্য রকম বিজয় দিবস'। আমার কাছে বিজয় দিবসটি অন্য রকম মনে হয়েছিল। কারণ, যে মুক্তিযোদ্ধারা এই দিনটিতে বাংলাদেশের জন্য বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন, তাদের একজন শাহরিয়ার কবিরকে সেই বিজয় দিবসে 'রাষ্ট্রোদ্রোহিতা' নামক একটা কষ্টকল্পিত অভিযোগে জেলখানায় আটকে রাখা হয়েছিল। এক বছর পর আবার বিজয় দিবস এসেছে, প্রথম আলো আবার আমাকে লিখতে বলেছে এবং লিখতে বসে আমি আবিষ্কার করেছি যে, এই বিজয় দিবসে অন্য আরো অনেকের সঙ্গে শুধু শাহরিয়ার কবিরকে নয়, এবারে মুনতাসীর মামুনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। (আবেদ খানকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল।) শুধু যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা নয়; রিমান্ড নামক একটি ভয়ঙ্কর অমানবিক প্রক্রিয়ায় তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে ডিসেম্বর মাসটি এখন খুব চিন্তাভাবনা করে আলাদা করে রাখা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যারা কথা বলেন তাদের পীড়ন করার জন্য। এটি এখন আর অন্য রকম বিজয় দিবস নয়, মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রু ক্ষমতায় চলে আসায় এখন এটি একটি অন্য রকম বাংলাদেশ, এটি একটি দুঃখী বাংলাদেশ এবং এই বাংলাদেশে এটিই 'স্বাভাবিক' বিজয় দিবস। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে মুক্তিযোদ্ধারা এক ধরনের কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করে, এবারে কাকে ধরা হবে? কাকে পীড়ন করা হবে? কাকে নির্যাতন করা হবে? কার ওপর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া হবে?

মুনতাসীর মামুন বা শাহরিয়ার কবিরকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা আবেদ খানকে কেন গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেই ব্যাপারগুলোর কিছু পুলিশি ব্যাখ্যা আছে (দেশে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি, দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট, রাষ্ট্রোদ্রোহী কাজ ইত্যাদি)। যারা পড়েন তাদের কেউই সেগুলো বিশ্বাস করেন না, এমনকি যে পুলিশ অফিসাররা এগুলো কাগজে লেখেন তারা নিজেরাও এগুলো একবর্ণ বিশ্বাস করেন না। সবাই জানে, এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে সরাসরি কিছু মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন,

রাজাকারদের সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করেন, তাদের এক হাত দেখিয়ে দেওয়াটা হচ্ছে মূল ব্যাপার। জনকণ্ঠ পত্রিকায় একাত্তরের দেশদ্রোহীরা কে কোথায় আছে তার ওপরে একটা প্রতিবেদন ছাপা হতো। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর যারা সেটি লিখত তাদের ওপর সুপরিকল্পিত পীড়ন শুরু হয়েছে। সরকারি সাহায্য থাকলে থানা পুলিশ কোর্ট দিয়ে একজন মানুষের জীবনকে বিষাক্ত করে ফেলার মতো সহজ ব্যাপার আর কী হতে পারে? আজকাল খবরের কাগজে প্রতিদিনই দেখছি থানা পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটরা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে যা খুশি করছেন। যদি দেখা যায় ধীরে ধীরে হাইকোর্ট একটি ক্ষমতাহীন প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে গেছে, সরকার জোর-জুলুম করে সবকিছু করছে, তখন আমাদের কী হবে?

২.

শাহরিয়ার কবির, মুনতাসীর মামুন বা আবেদ খানের মতো মানুষদের জন্য আমার এক ধরনের গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। আমি মফস্বলে থাকি বলে তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বলতে গেলে হয়ই না, টেলিফোনেও যোগাযোগ নেই। কিন্তু তারপরও তাদের সঙ্গে আমি এক ধরনের আত্মিক যোগাযোগ অনুভব করি। গত বছর বিজয় দিবেসে আমি শাহরিয়ার কবিরের কথা লিখেছিলাম, এই বছর তার সঙ্গে সঙ্গে মুনতাসীর মামুনের কথা লিখতে হচ্ছে। মুনতাসীর মামুনের মতো আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, তার মতো আমিও লেখালেখি করার চেষ্টা করি। তবে তিনি লেখালেখিকে আমার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব নিয়ে নিয়েছেন এবং তার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি হিসেবে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন। মুনতাসীর মামুন একজন কলাম লেখক হিসেবে সুপরিচিত। তার মতো আমিও মাঝে মধ্যে খবরের কাগজে নিজের ক্ষোভের কথা লেখার চেষ্টা করি। কিন্তু তার লেখা পড়ে, লেখায় গবেষণা এবং তথ্যের পরিমাণ দেখে নিজের লেখা নিয়ে আমি সবব সময় এক ধরনের সংকোচ অনুভব করেছি। মুনতাসীর মামুন একজন ইতিহাসবিদ, একজন ঝানু গবেষক। ঢাকা নগরীর জন্য তার ভেতরে এক ধরনের গভীর মমতা রয়েছে এবং এই নগরীকে নিয়ে তার নানা ধরনের স্বপ্নের অনেকগুলোই তিনি বাস্তবায়ন করেছেন। সংস্কৃতিমনা তেজস্বী এই শিক্ষকের অসংখ্য পরিচয়ের মাঝে আমার কাছে তার সবচেয়ে বড় পরিচয় মুক্তিযুদ্ধের একজন সত্যিকার গবেষক হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার মতো এত গবেষণা আর কেউ করেছে বলে আমার জানা নেই। যে সরকার মুনতাসীর মামুনকে নিপীড়ন করার জন্য জেলে

পাঠিয়েছে, সেই সরকারের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় রয়েছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এই মন্ত্রণালয়ে যখন কোনো তথ্যের প্রয়োজন হবে, তাদের ঘুরেফিরে মুনতাসীর মামুনের লেখালেখির মাঝে ফিরে আসতে হবে। আমাদের দেশে গুণীর কদর করা হয় না বলে এক ধরনের অপবাদ আছে এবং সেই অপবাদটি মুখ বুজে মেনে নিয়েই আমরা বেঁচে থাকতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু বেছে বেছে আমরা গুণী মানুষদের অত্যাচার করি এই নতুন অপবাদটি কেন আমাদের গায়ে সিল মেরে লাগিয়ে দেওয়া হলো? আমরা কেন সেটা মাথা পেতে নেব?

৩.

বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে—আজকাল প্রায়ই এই অপবাদটি বিভিন্ন মানুষকে দেওয়া হচ্ছে। এই অপবাদটি আমার কাছে খুব হাস্যকর একটা কথা বলে মনে হয়। ইন্টারনেটের যুগে পৃথিবী কত কাছাকাছি চলে এসেছে কথাটা কী কেউ কখনো ভেবে দেখেছে? আজকাল তথ্যের ব্যাপারে দেশ এবং বিদেশের মাঝে যে-কোনো সত্যিকারের বিভাজন নেই, সেটা কী এখনো সবাই জানে না? সেদিন ভোরবেলা আমি আমার ই-মেইলগুলো দেখছি, তখন দেখলাম অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন আমার লেখা একটি কলাম পড়ে নিজের মন্তব্যটুকু লিখে পাঠিয়েছেন। আমি মফস্বলে থাকি, আমি খবরের কাগজটি পাই দুপুর বেলা, তাই আমার লেখাটি যে ছাপা হয়েছে আমি নিজেই সেটা তখনও জানি না। কিন্তু তার আগেই সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় একজন সেটি পড়ে তার মন্তব্যটুকুও লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে। আজকাল সব খবরের কাগজ ইন্টারনেটে চলে এসেছে। যে তথ্যটি দেশের মানুষের কাছে আছে, সেটি বিদেশেরও সবার কাছে আছে। কাজেই বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপবাদ একটি হাস্যকর অপবাদ। সরকারকে জানতে হবে বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি রক্ষা করার একটি মাত্র উপায়, সেটি হচ্ছে দেশের মানুষের কাছে নিজের ভাবমূর্তিটুকু রক্ষা করা। সরকার কী বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে, এই সরকার তার দেশের মানুষের কাছে ভাবমূর্তি ঠিক রাখতে পেরেছে?

ময়মনসিংহের সিনেমা হলগুলোতে নৃশংস বোমা হামলার ঘটনার পর তার সঙ্গে শাহরিয়ার কবির এবং মুনতাসীর মামুনকে জড়ানোর একটা অপচেষ্টা করা হচ্ছে বলে মনে হলো। (সিএনএন থেকে তাদের গ্রেপ্তারের খবরটুকু প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে টেলিফোন আসতে শুরু করেছে, সবাই জানতে চাইছে আমিও কী গ্রেপ্তার হয়ে যাচ্ছি কী না! লেখক-সাহিত্যিকদের

যারা সরকারকে সমালোচনা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে যাদের বুকে মমতা রয়েছে তারা এখন খুব বিপদের মাঝে আছেন, এটি এখন বাংলাদেশে জানাজানি হয়ে গেছে।)

এ পর্যন্ত এ দেশে বোমা হামলা তো খুব কম হয়নি। স্মৃতি থেকে যদি লিখি, তাহলে দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে বামপন্থী সিপিবির জনসভায়, আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমানের অফিসে, কাদিয়ানিদের মসজিদে, খ্রিস্টানদের গির্জায়, উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, নববর্ষে রমনার বটমূলে, সাতক্ষীরার সিনেমা হলে, সার্কাসে এবং সর্বশেষ হচ্ছে ময়মনসিংহের একাধিক সিনেমা হলে। কারা বোমা হামলাকারী আমরা এখনো জানি না। কিন্তু কাদের বিরুদ্ধে হামলা আমরা সেটা জানি। এই দেশে কারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা বিনোদন বন্ধ করতে চায়, বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে কাদের গাত্রদাহ হয়, কোন ধরনের মানুষ কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে, কারা সাম্প্রদায়িক, বামপন্থী দলগুলো কাদের সবচেয়ে বেশি চক্ষুশূল আমরা সেটি অনুমান করতে পারি। আমরা ঠিক মানুষ বা ঠিক সংগঠনটির দিকে আঙুল নির্দেশ করতে পারি না কিন্তু বোমা দিয়ে হত্যাকাণ্ডের সেই ভয়ঙ্কর মানুষগুলোর মানসিক প্যাটার্নটি অনুভব করতে পারি। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের রহস্যের একটিও কিনারা হয়নি।

আমি একেবারে লিখে দিতে পারি—পুলিশ, সিআইডি, ডিবি, মিলিটারিকে দায়িত্ব না দিয়ে যদি দেশের সাংবাদিকদের এই দায়িত্ব দেওয়া হতো তারা এক মাসের ভেতর বের করে ফেলতেন কারা এটি ঘটিয়েছে। রমনার বটমূলে যারা বোমা নিয়ে এসেছে তাদের কেউ কেউ বোমা হামলায় মারা গিয়েছে। তাদের নাম-পরিচয় দিয়ে শুরু করে তারা কোন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত সেটি বের করা কি এতই কঠিন? ময়মনসিংহের ভয়াবহ বোমা হামলার মাঝেও নাকি একজন বোমা বহনকারী মারা গিয়েছে, তার নাম-পরিচয় থেকে তার সংগঠন খুঁজে বের করতে কতক্ষণ লাগে? অবস্থা দেখে মনে হয়, দেশের পুলিশ, সিআইডি, ডিবিসহ অন্য সবাইকে যেন লাগানো হয়েছে এই বোমা হামলাকারীদের রক্ষা করতে। মনে হয় তাদের ওপর বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন এই বোমা হামলাকারীদের পরিচয়টি সযত্নে গোপন রাখে। কোনো রকম তদন্ত ছাড়াই যেভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রীরা আওয়ামী লীগ, শাহরিয়ার কবির, মুনতাসীর মামুনদের ওপর এ রকম একটা নারকীয় ঘটনার দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন, এখন তদন্তকারীরা তো সত্য উদঘাটন করলেও তা প্রকাশ করতে পারবে না। বরং এখন তাদের দায়িত্ব হয়ে যাচ্ছে তদন্ত

করে প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রীদের বক্তব্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। কিছুদিন আগে বোমা হামলার জন্য একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়েছিল, সেই কমিশনের রিপোর্ট পড়ে দেশের মানুষ হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না। সেটি এত উদ্ভট এবং হাস্যকর যে, সরকার স্বয়ং সেটি কোথায় নিয়ে লুকাবে সেটি ঠিক করতে পারেনি। (এই বিচারক ভদ্রলোকের অতীত ইতিহাস পড়লে অবশ্যি তদন্ত কমিশনের রিপোর্টটি নিয়ে আর কোনো বিস্ময় হয় না। তিনি বিশ্বাস করেন, গণআদালতে গোলাম আযমকে বিচার করার কারণে মিসেস জাহানারা ইমামের ক্যান্সার হয়েছিল। মিসেস জাহানারা ইমাম যে তার অনেক আগে থেকে এই দুরারোগ্য অসুখে ভুগছেন সেটি এই ভদ্রলোক জানেন না বা জানার প্রয়োজন মনে করেন না।) ময়মনসিংহের ঘটনার পর আবার একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন তৈরি করা হয়েছে, তার দায়িত্বে যিনি আছেন তিনি কেমন দায়িত্ব পালন করবেন আমরা এখনো জানি না। যদি আগের মতোই হয় তা হলে যে সারা দেশের মানুষের সামনে পুরো বিচার বিভাগকেই হেয় করা হয় সেটি কী কেউ ভেবে দেখেছে? বোমা হামলা নিয়ে আমাদের মনেই এত প্রশ্ন, দেশ-বিদেশে যারা এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করে তাদের মনে কি প্রশ্ন আরো ১০ গুণ বেশি নয়? দেশের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে হলে কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না? সবাইকে গ্রেপ্তার করে জেলে ঢুকিয়ে কি এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে? বাংলাদেশ একটি উগ্র মৌলবাদী দেশ হিসেবে বিদেশের সংবাদপত্রে প্রচার করা হচ্ছে, এটি শুরু হয়েছিল তসলিমা নাসরীনকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করার সময়ে। আমি তখন দেশের বাইরে ছিলাম এবং এই প্রচারণাটি আমাকে খুব ব্যথিত করেছিল। আমি জানি আমাদের দেশের মানুষ কখনোই উগ্র মৌলবাদী নয়, তারা সহজ-সরল ধর্মভীরু মানুষ; কোনোভাবে খেয়েপরে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। তারা সহনশীল এবং অসাম্প্রদায়িক। অল্প কিছু চরম ধর্মোন্মত্ত মানুষ ধর্মকে ব্যবহার করে দেশে একটি তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে সারাদেশটির মুখে অপবাদের গ্লানি মাখিয়ে দেয়।

এখন আবার নতুন করে এই অপবাদের গ্লানি আসতে শুরু করেছে, এই প্রচারণা শুরু হয়েছে—তার ফলাফল হবে ভয়ানক। তার সবচেয়ে প্রথম ধাক্কাটি অনুভব করবে প্রবাসী বাঙালি, তারপর তার ছোঁয়া পাবে দেশের সব মানুষ, ব্যবসা-বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। এই অপবাদ থেকে মুক্তি পেতে সবার সমানভাবে কাজ করতে হবে, সবচেয়ে বড় দায়িত্ব সরকারের। সরকার কী সেজন্য প্রস্তুত?

জোট সরকারের জন্য ব্যাপারটি সহজ নয়; তাদের জোটে এমন ব্যক্তি আছেন যার উপস্থিতিতে একজন নিরপরাধ নিরীহ পুলিশকে একটি মসজিদে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের দলের অন্য শরিক জামায়াতে ইসলামী একাত্তরের গণহত্যায় সরাসরি সহায়তা করেছে, স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে এই দেশের বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। কিছু দিন আগেও তারা সবাই ধর্মোন্মত্ততা প্রচার করেছে। এই দেশের মাটিতে স্লোগান দেওয়া হয়েছে, 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান।' প্রকাশ্য জনসভায় আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের নাম ধরে তাদের হত্যা করার হুমকি দিয়েছে। আমি অন্তত একটি জনসভার কথা জানি, যেখানে বর্তমান মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের উপস্থিতিতে আমাকে মুরতাদ ঘোষণা করে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তিনি কি তখন এই ধরনের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন? ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের দাবড়ানি খেয়ে এখন সবাই গর্তে ঢুকে গেছে, কারো মুখে টু শব্দ নেই। বছর দেড়েক আগের খবরের কাগজ ঘেঁটে কেউ কি দেখতে চান এই দেশে কারা কী বলে, কারা কী বিশ্বাস করে?

এখন যদি বাংলাদেশকে উগ্র মৌলবাদীদের দেশ বলা হয় তার দায়িত্ব নিতে হবে শাহরিয়ার কবির এবং মুনতাসীর মামুনকে? এর চেয়ে উৎকট রসিকতা আর কী হতে পারে?

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান যে দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই দলে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছেন, তাদের শাসনকালে মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী মানুষদের ওপর নির্যাতনের একটি স্টিমরোলার চালিয়ে দেওয়া হয়েছে—এই ব্যাপারটি তারা কীভাবে সহ্য করেন আমি জানি না। এই রাজনৈতিক দলের তরুণ কর্মীদের ভয়ঙ্কর ক্ষোভ এবং দীর্ঘশ্বাস তারা কী শুনতে পান না? তাহলে আমি কেমন করে শুনতে পাই?

কেন আজ আমাদের জিজ্ঞেস করতে হয়, এটি কোন বাংলাদেশ?

দৈনিক প্রথম আলো, ১৬/১২/২০০২

স্বপ্ন দেখার সুযোগ

আগেই বলে রাখছি আমি রাজনীতির কিছু বুঝি না। ব্যাপারটি সম্পর্কে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছিলাম গত নির্বাচনের ঠিক আগের মুহূর্তে যখন দেখতে পেয়েছিলাম নমিনেশান না পেয়ে এক দলের নেতা অন্য দলে ছুটে যাচ্ছেন এবং অন্য দলের মানুষ নিজের লোককে আস্তাকুড়ে ফেলে দলত্যাগী এই প্রতারকদের বুকে চেপে ধরে নির্বাচনে বসিয়ে দিচ্ছেন। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করেছিলাম রাজনীতিতে নীতি বা আদর্শের কোনো বালাই নেই। যে-কোনো দলের মানুষ যে-কোনো দলে যোগ দিতে পারে, আদর্শ নয় দলটিই বড় এবং রাতারাতি এক দলের মানুষ অন্য দলের মানুষ হয়ে যেতে পারে—এর চাইতে ভয়াবহ ব্যাপার আর কী হতে পারে? এই পুরো অনৈতিক প্রক্রিয়াটিকে হালাল করার জন্যে রাজনৈতিক নেতাদের আরো একটি ভয়ংকর কথা বলতে শুনেছিলাম, সেটি হচ্ছে "রাজনীতিতে কোনো শেষ কথা নেই।" আমি কথাটিকে অন্যায় অসত্য—এমন কী অশালীন একটি কথা বলে মনে করি। শুধু রাজনীতি নয়, পৃথিবীর সব ব্যাপারেই একটি শেষ কথা থাকতে হবে, সেই শেষ কথাটি আদর্শের কথা ও নীতির কথা এবং পৃথিবীর কোনো শক্তি সেই আদর্শ বা নীতির ব্যাপারে আপোষ করাতে পারবে না।

আমাদের দেশে রাজনীতি কথাটি এখন খুব নেতিবাচক একটি কথা। বিয়ের প্রস্তাব এলে "ছেলে রাজনীতি করে" বললে কোনো মেয়ের বাবা-মাই সেই বিয়েতে রাজী হবেন না। ব্যাপারটি একদিনে হয়নি, খুব ধীরে ধীরে হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ব্যাপারটি আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং আমার ধারণা মিলিটারী নামার পর অবস্থাটি সর্বনিম্ন একটা পর্যায়ে হাজির হয়েছে। সবগুলো খবরের কাগজ তাদের কাগজে জায়গা নির্দিষ্ঠ করে রেখেছে যেখানে প্রতিদিন কোন কোন রাজনৈতিক নেতা কর্মীকে কোন এলাকা থেকে সন্ত্রাসী বা দুর্নীতির অপরাধে ধরা হয়েছে সেটা বড় বড় হরফে লেখা হয়। মানুষজন সেগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে পড়ে এবং প্রতিদিনই রাজনীতির ওপর তাদের মন আগের দিন থেকে বিষাক্ত হয়ে যায়।

আমার ধারণা দেশের জন্যে সেটি খুব খারাপ একটি ব্যাপার হচ্ছে।

আমরা যদি নিশ্চিতভাবে ধরেই নিই রাজনীতি ব্যাপারটি খারাপ তাহলে সেখানে তো আর কোনো আদর্শ বা নীতিবান মানুষ আগ্রহ বোধ করবে না। সেখানে যাবে শুধুমাত্র সুযোগ সন্ধানীরা। দেশের জন্যে, জাতি বা সমাজের জন্যে যাদের বিন্দুমাত্র মমতা নেই; যারা রাজনীতি করবে ক্ষমতার জন্যে এবং ক্ষমতায় যাবে শুধুমাত্র নিজের আখের গোছানোর জন্যে। রাজনীতি থেকে নীতি এবং আদর্শ, দেশ এবং জাতি এই ব্যাপারগুলো উঠে যাবে, সেখানে থাকবে শুধু দল। রাজনীতির পুরো ব্যাপারটি পাল্টে যাবে দলবাজী নামে কুৎসিত একটি শব্দে।

কিন্তু সেটি কিছুতেই হতে পারবে না, কিছুতেই সেটা হতে দেয়া যাবে না, তা হলে আমরা কোনোদিন মাথা তুলে দাড়াতে পারব না। যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে তিরিশ লক্ষ মানুষকে বুকের রক্ত দিতে হয়েছে সেই দেশটি সুযোগ থাকার পরও মাথা তুলে দাড়াতে পারবে না সেটি তো হতে পারে না। জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাড়িয়ে আমাদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে এবং সেজন্যে যেভাবেই হোক রাজনীতিকে কলংকমুক্ত করতে হবে। কারণ এই দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেবে রাজনৈতিক নেতারা, তাদের একটি সঠিক সিদ্ধান্ত দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে ফেলতে পারে, একটি ভুল সিদ্ধান্তে লক্ষ লক্ষ মানুষ অভুক্ত থেকে মারা যেতে পারে। তাদের একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত দেশকে অশিক্ষার কবল থেকে মুক্ত করতে পারে, একটি ভুল সিদ্ধান্ত পুরো দেশকে ধর্মান্ধ মৌলবাদের দেশের দিকে ঠেলে দিতে পারে। দেশের সবচেয়ে বড় এই শক্তি রাজনীতিকে যেভাবেই হোক আমাদের পরিশুদ্ধ কলংকমুক্ত সম্ভাবনার পথে টেনে আনতে হবে।

সেটি কীভাবে সম্ভব? আমার তার উত্তর জানা নেই, কিন্তু আমি তো তার স্বপ্ন দেখতে পারি। আমার স্বপ্নে তো কেউ এসে বাধ সাধতে পারবে না।

আমি স্বপ্ন দেখি আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা একেবারে তৃণমূল থেকে ওঠে আসবে। যে মানুষটি দীর্ঘদিন থেকে সাধারণ মানুষের সাথে থেকেছে, তাদের সাথে বড় হয়েছে, তাদের সুখ দুঃখের ভাগীদার হয়েছে তারাই তাদের নেতৃত্ব দিক। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তাদের সহায়তা করুক। অর্থ নির্ভর রাজনীতি চিরতরে এই দেশ থেকে দূর হয়ে যাক। আজকাল খুব খারাপ একটি উদাহরণ তৈরি হয়েছে—রাজনীতির সাথে সম্পর্ক নেই সেরকম আমলা, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হঠাৎ করে রাজনীতিতে চলে আসছেন। তারা প্রথমে মন্ত্রী হচ্ছেন তারপর প্রাণপন চেষ্টা করছেন নেতা হওয়ায় জন্যে।

আমি স্বপ্ন দেখি এই মৌসুমী রাজনীতিবিদরা যেন সত্যিকারের রাজনীতিবিদদের অপসারণ করতে না পারে।

বিগত কয়েক দশকের রাজনীতির ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস নয়—আমি স্বপ্ন দেখি যে পুরাতন রাজনীতিবিদরা, যারা এই ব্যর্থ রাজনীতির নেতৃত্ব দিয়ে পুরো রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটাকে একটা বিতর্কিত নেতিবাচক ব্যাপারে তৈরি করে ফেলেছেন তারা সরে গিয়ে নতুন নেতৃত্বকে সুযোগ করে দেবেন। নতুন নেতৃত্বের মাঝে জ্ঞানীগুণী এবং শিক্ষিত মানুষেরা থাকবেন। তারা তৃণমূলের রাজনীতিতে অংশ নেবেন। নূতন পৃথিবী হঠাৎ করে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গেছে, আমি স্বপ্ন দেখি সেই কথাটি মনে রেখে বিজ্ঞান মনস্ক মানুষেরা রাজনীতির সাথে নিজের জীবনকে সম্পৃক্ত করবেন (নতুন চীনের নেতৃত্বের প্রায় সবাই ইঞ্জিনিয়ার সেটি কী একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা?)

আমি স্বপ্ন দেখি রাজনীতিতে আবার 'ত্যাগ' ফিরে আসবে। রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনে জেতার জন্যে রাজনীতি করবেন না, দেশকে সেবা করার জন্যে রাজনীতি করবেন। এই দুঃখী দেশটিকে নিজের পায়ে দাড়া করানোর জন্যে তারা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করবেন। আমি স্বপ্ন দেখি রাজনীতির অন্য নাম হবে আত্মোৎসর্গ। যারা সেটি বিশ্বাস করবেন না তারা রাজনীতিতে আসবেন না, অর্থবিত্ত সম্পদ গড়ে তোলার জন্যে তারা ঠিকাদারী করবেন, ব্যবসা করবেন, ইন্ডাস্ট্রি দেবেন। ভবিষ্যতে এম.পি হবেন বা মন্ত্রী হবেন সেই স্বপ্ন দেখে কেউ যেন রাজনীতি করতে না আসে, দেশের জন্যে কিছু একটা করার স্বপ্ন থেকে তারা যেন রাজনীতির সাথে নিজের জীবনকে সম্পৃক্ত করে। সরকার পরিবর্তন হলে যে নেতা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়, রাজনীতিতে তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি স্বপ্ন দেখি তেজস্বী নেতাদের যারা জেল খাটতে ভয় পায় না, নিপীড়ন নিগ্রহতে হতোদ্যম হয় না যারা সত্য এবং ন্যায়ের পক্ষে থেকে অবিচল ধৈর্য্য নিয়ে সবচেয়ে দুঃসময়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায়।

আমি রাজনীতি থেকে চাটুকার এবং স্তাবকের দলকে পুরোপুরি নির্বাসিত করার স্বপ্ন দেখি। এই পরজীবী গোষ্ঠী কখনো কোথাও কারো জন্যে শুভ কিছু বয়ে আনেনি। তার উদাহরণ দেয়ার জন্যে বলা যায় দল হিসেবে আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছিল সেই সমস্ত চাটুকাররা যারা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়েছিলেন গণভবনকে তিনি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন কিংবা পৃথিবীর যতো অখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তার জন্যে অনারারি ডিগ্রী নিয়ে এলে তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তিনি সেই

গণভবনে নেই, সেই ডিগ্রীও তার কোনো কাজে আসছে না কিন্তু ক্ষতিটুকু যা হবার তা হয়েছে ষোলো আনার উপর আঠারো আনা! এরকম কয়টি উদাহরণ প্রয়োজন? কোন দলের কোন মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে?

আমি আগেই বলেছি যে রাজনীতির আমি কিছু বুঝি না। তাই খুব অবাক হয়ে দেখি যে হরতালকে সফল করার জন্যে কী অবলীলায় এক-দুইজন রিক্সাওয়ালা বা টেম্পোচালককে পুড়িয়ে মারা হতো। সন্ত্রাসনির্ভর এই রাজনীতি থেকে আমরা মুক্তি চাই যেটুকু আমাদের জন্যে তার থেকে অনেক বেশি রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যে। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি সন্ত্রাসকে উৎখাত করার কথা বলে মিলিটারি এসেছে, দেশের মানুষ সেটাকে স্বাগতম জানিয়েছে। আমরা কিছুতেই এর পরের ধাপে যেতে চাই না যেখানে সন্ত্রাস আতংকিত, দুর্নীতিতে ওষ্ঠাগত এবং রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ মানুষ সাময়িকভাবে নয়, পূর্ণাঙ্গ সামরিক শাসনের জন্যে অপেক্ষা করতে শুরু করবে।

অবস্থা যত খারাপই হোক আমরা এখনো ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারি, তখন কিন্তু আমাদের স্বপ্ন দেখার সুযোগটিও থাকবে না।

স্যুভেনির, আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন ২২/১২/০২

নববর্ষ : ভাবনা এবং দুর্ভাবনা

নববর্ষের দিনটি যে অন্য দশটি দিন থেকে ভিন্ন তা নয়। এই দিনটিতে প্রকৃতি আলাদাভাবে কোনো আয়োজন করে না, সূর্য সেদিন আগে ওঠে না, দেরি করে অস্ত যায় না। গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য সেদিন নতুন করে কিছু শুরু করে না—আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য এ দিনটিকে 'নববর্ষ' নাম দিয়ে সেটিকে একটু ভিন্ন চোখে দেখি। এ দিনটি এলেই নিজের অজান্তেই আমরা একটু সচকিত হয়ে উঠি। দেখতে দেখতে কেমন করে আরো একটি বছর পার হয়ে গেল সেটি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করি এবং গত এক বছরের হিসাব-নিকাশ নিয়ে বছরটি কেমন কেটেছে তা বের করার চেষ্টা করি। বছরটি ভালোভাবে কাটলে সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই, খারাপভাবে কাটলেও আমরা ঘাবড়ে যাই না; নতুন বছরটি নিশ্চয়ই অন্য রকম হবে, নতুন কিছু হবে, শুভ কিছু হবে—সেরকম একটা আশা নিয়ে, আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করি। যত দুঃসময়ই হোক, নববর্ষ সবসময়ই আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখার একটা সুযোগ করে দেয়।

আমার ব্যক্তিগত হিসাবে আমরা এখন একটা দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। ব্যাপারটি নিয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি আমার কাছে পাঠানো নববর্ষের কার্ডগুলো দেখে। তার একটা বড় অংশ আমার নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছেন, নববর্ষ যেন আমাকে জেলখানায় কাটাতে না হয় তার জন্য দোয়া করছেন। ব্যাপারটি ঠাট্টা-তামাশা বা রসিকতা করে নয়, সাধারণ মানুষের সাধারণ উদ্বেগ থেকে লেখা। বাংলাদেশের সবাই জেনে গেছে যে, সরকারের কাজকর্মের সমালোচনা করেন এ রকম লেখক-সাংবাদিক হঠাৎ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত সম্প্রদায়। আমার জানা মতে, এই প্রথমবার আমরা নতুন বছরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি যখন আমাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, লেখক ও সাংবাদিকরা জেলখানায় আটক রয়েছেন। সুনির্দিষ্ট কোনো কারণে তাদের আটকে রাখা হয়নি, তাদের আটকে রাখা হয়েছে এক ধরনের প্রতিহিংসা থেকে, সেটি নিয়ে কোনো লুকোছাপা নেই। এর মধ্যে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার পাওয়া দুজন লেখক রয়েছেন, বাংলা একাডেমীর

পক্ষ থেকে তাদের মুক্তির দাবি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিনাবিচারে আটকে রাখা দুজন সাহিত্যিকের মুক্তি দাবি করার মতো মানবিক একটি দাবি বাংলা একাডেমীর সদস্যদের পক্ষ থেকে আসতে পারেনি কিছু সদস্যের আপত্তির কারণে। যারা আপত্তি করেছেন তারাও আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী—এই দুঃখ আমরা কোথায় রাখি?

অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, আমরা নতুন বছরে প্রবেশ করছি একটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে। একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করার জন্য তার স্ত্রীকে নির্যাতন এখন একটি গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া। একজন মহিলা সাংবাদিককে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার ঘটনায় দেশের মানুষ আর শিউরে ওঠে না। যে মানুষরা মানুষের ওপর এ রকম অত্যাচার করে, খবরের কাগজে তাদের নাম ছাপা হয় কিন্তু তারা সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়।

লেখক-সাংবাদিকদের এ দুঃসময়ে দেশ আরো একটি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে, সেটি হচ্ছে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে অভিযান। নতুন বছরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষ একটু ভিন্নচোখে তাদের দেখছে। ছিঁচকে সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার, অস্ত্র উদ্ধারের প্রাথমিক সাফল্যের পর সাধারণ মানুষের হয়রানি এবং সেনা হেফাজতে মৃত্যুর ব্যাপারটি বারবার উঠে এসেছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ব্যাপারটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যদিও আমরা জানি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মতো অসহায় রাষ্ট্রপতি সারা পৃথিবীতে আর একজনও নেই-রাজনৈতিক দল ইচ্ছে করলে যে-কোনো মুহূর্তে তাকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিতে পারে! সাধারণ মানুষ ইদানীং সেনাবাহিনীকে একটু ভিন্নচোখে দেখছে। 'প্রথম আলো'তে হেডলাইন এসেছে, "সরকার কীভাবে চলছে মন্ত্রীরা জানেন না!" সরকার কোনো আপত্তি করেনি, মন্ত্রীরা এই সংবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেনি, মানহানির মামলা হয়নি। তাহলে কি আমরা সত্যিই বিশ্বাস করে নেব, সরকার কীভাবে চলছে কেউ জানে না? সন্ত্রাস দমন ছাড়াও কি এদেশে সেনাবাহিনীর অন্য কোনো ভূমিকা আছে? নতুন বছরে আমাদের জন্য কি নতুন কোনো বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে?

নববর্ষের দিনে আমরা শুধু নিজের দেশ নয়, সারা পৃথিবীর দিকে একবার ঘুরে তাকাই। সারা বছরের অসংখ্য চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা হঠাৎ করে আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়। এই বছরে সেটি হয়েছে মানবশিশুর ক্লোন। যেদিন প্রথমবার একটি ভেড়ার শাবককে ক্লোনিং করা হয়েছিল, সেদিনই সারা পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পেরেছিল মানবশিশু ক্লোন করার প্রক্রিয়াটি মানুষের করায়ত্ত হয়ে গেছে, এখন শুধু সময়ের ব্যাপার কখন

একজন মানুষকে ক্লোন করা হবে। ভেড়াশাবক এবং মানবশিশু ক্লোন করার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য রয়েছে— বেঁচে থাকার জন্য ভেড়া কিংবা পশুপাখিকে আমরা কেটেকুটে খাই। চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য অসংখ্য পশুপাখি রুটিনমাফিক পৃথিবীর নানা ল্যাবরেটরিতে কেটেকুটে ফেলা হয়। ভেড়াশাবক ডলিকে ক্লোন করার আগেও অসংখ্যবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং পৃথিবীতে অসংখ্য অসম্পূর্ণ, অর্ধসমাপ্ত, বিকৃত বা বিকলাঙ্গ পশু জন্ম নিয়েছে। যে ভেড়াশাবকটি সফলভাবে জন্ম নিতে পেরেছে, আমরা শুধু সেটি নিয়েই হৈচৈ করেছি। মানুষের ক্লোন করার ব্যাপারেও হুবহু এই ব্যাপারটি ঘটার কথা, প্রথম প্রচেষ্টায় সফল একটি মানবশিশুর ক্লোন করার কথা নয়। অসংখ্য প্রচেষ্টার পর একটি সাফল্য আসার কথা। কিন্তু সাফল্য আসার আগে সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টায় কতকগুলো অসম্পূর্ণ, অর্ধসমাপ্ত, বিকৃত বা বিকলাঙ্গ শিশুকে জন্ম দেওয়া হয়েছে? কিংবা জন্ম না দিয়ে মাতৃগর্ভে হত্যা করা হয়েছে?

ক্লোনের পদ্ধতিটি মানুষ এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। একটি ক্লোন শিশু অকারণে বুড়িয়ে যেতে পারে, হঠাৎ করে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল বা অচল হয়ে যেতে পারে। ক্লোন করা একটি শিশু আজ থেকে পাঁচ কিংবা দশ বছর পর একটি দুরারোগ্য রোগে বা শারীরিক জটিলতায় আক্রান্ত হলে কাউকে কি দায়ী করা যাবে?

ক্লোন করা শিশুর এ ধরনের দৈহিক সমস্যা ছাড়াও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সমস্যা থাকতে পারে। একটি শিশু বড় হয়ে যখন আবিষ্কার করবে সে একজন আলাদা মানুষ নয়, অন্য একজন মানুষের হুবহু কপি, সে কি এ ব্যাপারটিকে নৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে? একজন মানুষকে অন্য মানুষের ক্লোন করে জন্ম দেওয়ার অধিকার কে দিয়েছে? কেউ কি সেই অধিকার দিতে পারে? মানুষের কি স্বতন্ত্র একজন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার নেই?

নতুন বছরে আমরা সম্ভবত প্রথমবার মানবজাতির এই একটি সম্পূর্ণ নতুন সমস্যার দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছি। বিজ্ঞানের গবেষণার এই নৈতিকতার প্রশ্নের পাশাপাশি এই মুহূর্তে সারা পৃথিবী অন্য একটি অশুভ দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সেটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ নিয়ে উন্মাদনা। যারা পৃথিবীর ইতিহাস পড়েছেন. তারা দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কীভাবে ইউরোপের দেশগুলো অত্যন্ত ভাবনা-চিন্তা করে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। ২০০৩ সালের শুরুতে আমরা হুবহু সেই একই ব্যাপার দেখছি। শুধু গায়ের জোরে কীভাবে একটি দেশ পৃথিবীর সকল শান্তিপ্রিয় মানুষকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একটি নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিতে পারে।

কোথায় জানি পড়েছিলাম, নতুন যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করতে আট থেকে দশ বছর সময় লাগে এবং একটি নতুন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করার পর সেটির ফিল্ড টেস্ট করার জন্য পৃথিবীর কোথাও একটা যুদ্ধ শুরু করতে হয়। এ জন্য পৃথিবীতে প্রতি আট থেকে দশ বছর পরপর যুদ্ধ হয়ে থাকে। সেই হিসেবে পৃথিবীতে এখন একটি যুদ্ধের প্রয়োজন এবং আমাদের হয়তো সেই যুদ্ধই দেখতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে যুদ্ধ দেখেছিল। আমার মনে আছে, অবরুদ্ধ বাংলাদেশে যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছিল তখন সাধারণ মানুষের মাঝে কী ভয়াবহ এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করছিল। এই মুহূর্তে ইরাকেও নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষজনের ভেতর সেরকম ভয়াবহ একটা আতঙ্ক কাজ করছে। ছোট ছোট শিশুরা নিশ্চয়ই ঘুমের ভেতর দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে জেগে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, কখন সেই আকাশে বোমারু বিমান গর্জন করে ছুটে আসবে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিতে। তাদের নিদ্রাহীন চোখে নিশ্চয়ই কী অসহায় আতঙ্ক!

পৃথিবীর মানুষ সম্ভবত একটি ভয়াবহ পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এই নতুন বছরটি কি মানুষের ওপর মানুষের সংঘাত দিয়ে কলঙ্কিত হবে? নাকি সাধারণ শান্তিকামী মানুষ একত্র হয়ে এই ভয়াবহ উন্মত্ততা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারবে?

কী অপেক্ষা করছে নতুন বছরে?

দৈনিক প্রথম আলো, ১/১/০৩